বিধবাবিবাহের

শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

১৮-নং টালা মেট্রোপলিটন প্রেসে

শ্রীভিখারিদাস বৈরাগী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২।

বিজ্ঞাপন।

আমি কেন এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ জানিতে বোধ হয় অনেকেই ইচ্ছুক। বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এ দেশে কোন গ্রন্থ নাই, তাহা নহে। তবে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্যকে অনেকেই শ্রেষ্ঠতর পথ বোধে, তাহা অবলম্বন করিতে বিধবাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন; এই সকল আপত্তির পরিষ্কাররূপে খণ্ডন এবং ব্রহ্মচর্য্যের নিকৃষ্টতা ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনের জন্য কোন ভাল গ্রন্থ নাই। অমার এ গ্রন্থ লেখার মুখ্যউদ্দেশ্যই এই যে, এই সকল আপত্তির প্রকৃত সদুত্তর দেওয়া, ব্রহ্মচর্য্য যে কিছুই নয়, প্রত্যুত অশেষ অনর্থকর, তাহা প্রতিপাদন করা। শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা যে, বিধবার বিবাহ শ্রেষ্ঠতর পবিত্রতর অনুষ্ঠান বিশেষভাবে তাহাই প্রতিপন্নের জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা; জানি না এ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' এই নামে একটি প্রবন্ধ কিছু কাল হইল, 'প্রভাতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহা আমারই লিখিত। সে প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে পৃথক, সুতরাং একরূপ নূতন বলিলেও চলে। এ গ্রন্থে আরও অনেক বিষয় লিখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের অল্পতাবশতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে সে সকল সন্নিবেশিত করিব। নিবেদনমিতি।

কলিকাতা
১৮৮৬। মার্চ } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

বিধবা

বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

অবতরণিকা।

জগতের বিগত ইতিবৃত্তের সহিত বর্ত্তমান কালের তুলনা করিলে, ইহাকে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তনের কাল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক এরূপ পরিবর্ত্তনস্রোত মানব সমাজে কখন প্রবাহিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। আজ যে মত সত্য ও অভ্রান্ত বোধে মানব চিত্ত গ্রহণ করিতেছে, কিছুকাল পরে দেখি তাহা অসত্য বোধে ঘৃণার সহিত পরিবর্জ্জিত হইতেছে। স্থিতিশীলতার পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীলতাই আধুনিক জনসমাজের ভিত্তিভূমি। এই পরিবর্ত্তনে যেমন এক দিকে মানব জাতি স্বাধীন চিন্তা ও বিচার শক্তি দ্বারা অসত্যকে দূরে পরিহার করিয়া দিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং পিপাসা দিন দিন বলবতী হইয়া উঠিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ সাগরবারির ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া অবনীমণ্ডলের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বিবিধ জাতি এবং সমাজকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিতেছে। এই সময় যদ্যপি আমরা একবার এই

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

অবসন্নমান ভারতক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, ইহার উপরেও ঘোর পরিবর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত। ইহার আঘাতে—ভারতের জীর্ণপ্রায় শ্লথমূলকীর্ত্তিস্তম্ভ সকল ঘন ঘন কম্পিত হইয়া পতিত হইয়া যাইতেছে, এদেশীয় অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং অভ্রান্ত মহাপুরুষদিগের পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রান্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবঞ্চক সংস্কারকেরা ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসভার পরিত্যাগ করত এক একবার, যেন উন্মত্তের ন্যায় এই প্রমত্ত বেগকে ফিরাইবার জন্য হস্ত বিস্তার করিতেছে। কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের জঙ্গল ক্ষেত্র সকল বহুদিন জলপ্লাবিত থাকায় অতি দূষিত ঘনীভূত বাষ্পরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময় ভারতের পক্ষে অতি সংকটাপন্ন কাল। বিনা বিচারে এই স্বাধীনতার যুগে কোন কথাই টিকিবে না। শাস্ত্রীয়ই হউক আর চিরাগতই হউক, যাহা যুক্তি এবং বিবেকের বিরুদ্ধ এ কালে তাহার কিছু মাত্র মূল্য নাই। শাস্ত্র কি? শাস্ত্র কি কেবল কতকগুলো অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত ছন্দোবদ্ধ পদ?—ইহাই যদ্যপি শাস্ত্র হয়, তবে তাহার আবার মূল্য কি? আদরই কি? তবে যদ্যপি এরূপ বল যে তুমি হিন্দু, হিন্দু হইলেই শাস্ত্র মানিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার উত্তরে আমরা বিনয়ের সহিত হিন্দুমাত্রকেই বলি, যে মানবাত্মার এরূপ মহত্ত্ব

বিনাশক অযোগ্য উপাধিতে আপনাদিগকে আর পরিচিত করিও না। বিধাতা প্রদত্ত অমূল্য শক্তিকে অবমানিত ও সঙ্কুচিত করা হয় যাহার দ্বারা, কি ছার সে উপাধি! তাহা মনুষ্যসমাজে বিলুপ্ত হউক। হিন্দু বলিলে কি তবে এই বুঝিব যে বুদ্ধিবিবেকশূণ্য বিচার শক্তিহীন একটি ইতর জীব? মহীয়সী হিন্দু সংজ্ঞার কি শেষ এই দশা ঘটিল? হিন্দু বলিলে কি আর মনুষ্য বুঝা যাইবে না। কেন না মানুষ বলিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহার স্বাধীন চিন্তা এবং বিচার শক্তি আছে। মানুষ যখন স্বাধীনতা ও বিচারশক্তিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট জীব, তখন সে আর ছাই ভস্ম যা তায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। মানুষ শাস্ত্রের যা তা মানিয়া লইতে পারে না তাহার পক্ষে দুইটি অতি সুন্দর যুক্তি আছে। প্রথম দেখা উচিত যে, শাস্ত্রকার যাঁহারা, তাঁহারা ও মানুষ তাঁহারা দেবতা নন্, তাঁহাদের মস্তিষ্ক আর কিছু মানুষের অপেক্ষা ১১ ইঞ্চি লম্বা নয়। সুতরাং তাঁহারা ও যখন মানুষ তখন এমন একটা কিছু মহৎ ভাবে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে না, যাহাতে তাঁহাদের সকল কথাই শিরোধার্য্য হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে তাঁহারা যখন মানুষ এবং মানুষ মাত্রেই ভ্রান্ত, তখন তাঁহারা ও ভ্রান্ত। তাঁহারা নিজেই যখন ভ্রান্তি জালে জড়িত তখন তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহার যে সকলই সত্য তাহার

প্রমাণ কি ? শাস্ত্রকারেরা যখন অভ্রান্ত নন্‌ সত্য মিথ্যায় জড়িত, তখন তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রের সকল কথাই যে সত্য হইবে তাহার কারণ কি ? শাস্ত্রের ভিতরে সত্য মিথ্যা দুইই আছে, তখন শাস্ত্রের সকল অংশই সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যদ্যপি করি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ! অনেক সময়ে সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যাকে গ্রহণ করিতে হয়। মনে করুন একজন ধনাঢ্য লোক আপনার একটি গৃহকে হীরক ও কাচ খণ্ডে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি এখন জানি, সেই গৃহ সমুজ্জ্বল হীরকদামে সুসজ্জিত আমি একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রিতে হীরকার্থী হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম এবং সম্মুখে এক মুষ্টি তুলিয়া লইয়া আসিতে আসিতে চিন্তা করিতে লাগিলাম আমার আর ভাবনা কি এই বারে সব দুঃখ ঘুচিল। কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখি তাহা হীরক নয় কাচ। তখন কি আমি আত্ম প্রতারিত হইলাম না ? অন্ধভাবে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিতে গেলেই এই ফল ফলে। গেলাম হীরকের আশায় পেলাম কাচ, এলাম সত্যের জন্য লইয়া চলিলাম মিথ্যা। কি বিড়ম্বনা ! শাস্ত্রকারেরা নিজে জানিতেন যে আমরা ভ্রান্ত সুতরাং আমাদের সকল কথা সত্য নয়, পাছে মানুষ সকলই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে সেই হেতু তাঁহারা সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন যে "হে মানুষ আলোক লইয়া প্রবেশ কর নচেৎ ঠকিবে" আলোক না লইয়া গেলে হীরকের পরিবর্ত্তে

কাচখণ্ড ধরিয়া ফেলিবে। সে আলোক কি? যুক্তি! যুক্তির আলোকে শাস্ত্রারণ্যে বিচরণ করিতে হইবে।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

বৃহস্পতি।

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়। ইহা শাস্ত্রকার দিগের অভিপ্রায়। যুক্তির মূল্য পূর্ব্বতন মহর্ষিরা এত অধিক বুঝিয়াছিলেন যে যুক্তিযুক্ত কথা একটা বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতেন কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মা যদ্যপি অযৌক্তিক কথা বলিতেন, তাহা হইলেও গ্রহণ করিতেন না †। এখন দেখা গেল শাস্ত্র গ্রাহ্য ততদূর যতদূর যুক্তির অনুমোদিত। সুতরাং যুক্তিযুক্ত যাহা তাহাই শাস্ত্র এবং অযৌক্তিক কথাই অশাস্ত্র। তবে যিনি যুক্তিবাদী তিনিই শাস্ত্রবাদী। অতএব যিনি অযুক্তিবাদী তিনি বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার হইলেও তাঁহার কথার কিছু মাত্র মূল্য নাই। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে শাস্ত্র যুক্তিসাপেক্ষ, কিন্তু যুক্তি শাস্ত্রসাপেক্ষ নয়। তবে যদ্যপি কোন বিষয় এরূপ হয় যে—যাহার উল্লেখ শাস্ত্রে নাই, কিম্বা হয়ত তাহা শাস্ত্রবিরোধী অথচ সে বিষয়

† বশিষ্ট।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

যুক্তিসম্মত তবে তাহার পক্ষে উপায় কি? তাহার উত্তরে আমরা এই বলি যে যুক্তির শক্তি যদ্যপি সর্ব্বোপরি এবং যৌক্তিকতার উপরই যদ্যপি শাস্ত্র নির্ভর করে তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বা অশাস্ত্রীয় হইলেও একান্ত করণীয়। এখন তবে আর হিন্দু শব্দের সে অর্থ টিকিল না—যে অর্থে হিন্দুকে মানব পদবী হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। পাঠক মহাশয়েরা এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন হিন্দু নামের এই অপূর্ব্ব অর্থ ব্যাখ্যাতা যাঁহারা, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জাতির গৌরবসাধক কি না? এস্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে, যুক্তির বিরোধী যে বিষয় তাহা যেমন কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারই পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না, সেই রূপ যুক্তির অনুমোদিত যে বিষয় তাহা হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই পক্ষে আদরণীয় হইতে পারে। যুক্তির নিকট সকলেই মস্তকাবনত করিবে, কিন্তু অন্যায়কে কেহ প্রশ্রয় দিবে না। আবার যুক্তিই যদ্যপি শাস্ত্র হয় তবে সে শাস্ত্রের প্রভুতা কে না স্বীকার করিবে? কিছুকাল হইতে এ দেশ মধ্যে একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে; সে প্রশ্নটি এই যে, 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইতে পারে কি না'? আমরা বলি এরূপ প্রশ্নের অবতারণাই সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ বিধবার বিবাহ যদি উচিত হয় অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয়, তবে সকলের পক্ষেই উচিত নচেৎ কাহারও পক্ষে উচিত নয়। কেন না যুক্তির

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

স্বপক্ষে সকলেই। কেহ বলিতে পারেন হয়ত যে বিধবার বিবাহ যদ্যপি শাস্ত্রসম্মত হয় তবেই হিন্দুর হওয়া উচিত। এ কথার উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বেই বিষদ ভাবে দিয়াছি। সুতরাং বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না? এবং বিধবাবিবাহ উচিত কি না এই দুই কথা কখন এক হইতে পারে না। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও উচিত, কেন না যদি তাহা যুক্তির অনুমোদিত হয়। সেই সকল লোক কি সমাজের একান্ত বিঘ্নকর নয়? যাহারা শাস্ত্রের কোন শাসন মানেন না, শাস্ত্রের কোন সম্মান রাখেন না, প্রত্যুত যাঁহাদিগের প্রতি আচরণে পূজ্যপাদ ঋষিগণের প্রণীত মূল্যবান্ গ্রন্থ সকল দিন দিন লোকের নিকট অবমানিত হইয়া যাইতেছে এবং হিন্দু নামে এক বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে। হে হিন্দু সমাজ! আর কতদিন বক্ষে এই কলঙ্কের ছবি ধারণ করিয়া থাকিবে। আমরা বলি বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুমোদিত অর্থাৎ ইহা অতি প্রাচীন সময় হইতে হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং ইহা হিন্দু সমাজের চিরন্তন প্রথা। বিধবাবিবাহ সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত সুতরাং এ ভাবেও শাস্ত্রীয়। বিধবাবিবাহের প্রচলনে সমাজের ভূয়সী কল্যাণ, অপ্রচলনে সমূহ অকল্যাণ। আমরা এ সকল কথা একে একে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। এ কাল পর্য্যন্ত বিধবা

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

বিবাহের বিপক্ষে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা প্রথমে সেই সকলের অসারতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

———

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আপত্তি খণ্ডন।
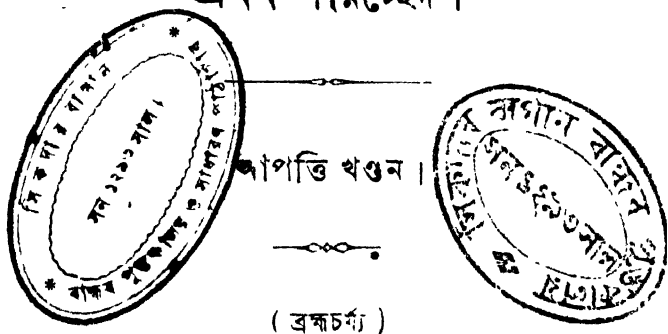
(ব্রহ্মচর্য্য)

১ ম। কলিযুগেব ধর্ম্মপ্রয়োজক পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্বু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা নারী লভতে স্বর্গ যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীবস্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে, পতিত হইলে স্ত্রী দিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা উচিত। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি দেহান্তে স্বর্গ লাভ করেন। এখন দেখা গেল স্বামীর দেহান্তে বিধবার পক্ষে

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

দুই প্রকার ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়াছে। † প্রথম পত্যন্তর গ্রহন দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য। এখন এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় বিবাহ না ব্রহ্মচর্য্য? কেহ বলিবেন ব্রহ্মচর্য্যই অগ্রে প্রশস্ত তাহাতে অসমর্থা হইলে পর বিবাহ। অপরে ঠিক ইহার বিপরীত বলেন বিবাহ প্রথমে বিধেয়, তাহা না হইলে পরে ব্রহ্মচর্য্য। তাহা হইলে বিধবাকে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যে প্রবৃত্ত করান হইবে? না বিবাহিতা করা হইবে। ইহা একটি বড় কঠিন সমস্যা। এ স্থলে তোমার আমার জোর-জবরদস্তি খাটিবে না। তুমিও বলপূর্ব্বক বলিতে পার না ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার পক্ষে পালনীয়, আমিও বলিতে পারি না বিধবাকে বিবাহ করিতেই হইবে। কিন্তু যদ্যপি এ ভাবে এ প্রশ্নের মীমাংসা করি যে বিধবার পক্ষে এ দুইটি পথই গন্তব্য, তবে পথিকের যে পথে যাইতে ইচ্ছা; তাহা হইলে ইহার সকল গোল মিটিয়া গেল। এরূপ স্থলে বাক্ বিতণ্ডার অবতারণা না করিয়া কর্ত্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেই মিটিতে পারে। বিধবা নারী ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ হইলে বিবাহই বিধি, নচেৎ ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু এ স্থলে আমাদের একটি কথা আছে, সেটি এই যে, আমাদের মতে বিধবার পালনীয় যে ব্রহ্মচর্য্য (যাহার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে) তদপেক্ষা বিধবা-

---

† সহমরণের ব্যবস্থা ও বর্ণিত আছে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজ শাসনে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা এ দেশ হইতে উঠাইয়া দেন।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

নারীর বিবাহই শ্রেষ্ঠতর এবং কল্যাণতর অনুষ্ঠান। আমরা ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন করিব যে, স্বর্গফলসাধক যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাহা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট, সে ব্রহ্মচর্য্যের পালনে কল্যাণের পরিবর্ত্তে বিশিষ্ট অকল্যাণ, ধর্ম্মের অচ্ছাদনে বিবিধ প্রকার অধর্ম্মের যাজনা। তাহা হইলে এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অপর পক্ষের ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যে যে যুক্তি আছে, তাহা একে একে খণ্ডন করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ আমাদের কথা স্থান পাইবে না। ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠতর কেন? না ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম ধর্ম্ম, বিবাহ কাম্য এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের যাজনাই উপনিষৎ ও গীতাদি শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং বিধবা নারী তাহাতেই রত থাকিয়া কালাতিপাত করিবে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম কি সকাম এ বিচারে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আমাদের অগ্রে দেখা উচিত ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপারটা কি? এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখি যে হিন্দু শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের কথা বিবৃত আছে। এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমিক, প্রাচীন কালের ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ আপনাদিগের জীবনকে আশ্রম চতুষ্টয়ের উপর দিয়া অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের সেই চতুরাশ্রমে প্রথমাশ্রমের নাম ও ব্রহ্মচর্য্য। উপনয়ন সংস্কার হইলে পর হিন্দু সন্তানগণ আচার্য্য বা উপাধ্যায় সমীপে গমন করিয়া এই আশ্রমিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। এই আশ্রমিক ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু শাস্ত্রে পরম পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব আমরা

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

পাঠক মহাশয় দিগকে বলিয়া দিতেছি যে, যেন তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া এই আশ্রমিক ব্রহ্মচর্য্যকে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া গ্রহণ না করেন। যদিও নামে এক, কিন্তু নিয়ম ও অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখন দেখিতে হইবে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য কি?

"ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনবর্জ্জনং তাম্বুলাদি বর্জনঞ্চ।
একাহারঃ সদা কার্য্যঃ ন দ্বিতীয় কদাচন।
পর্য্যঙ্ক শায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥
গন্ধ দ্রব্যস্থ সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিল কুশোদকৈঃ॥

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম।

রক্তশাকং মসূরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেবচ।
অলাবু বর্ত্তুলাকারাং বর্জ্জনীয়াচ তৈরপি।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
যানামারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ।
ন কুর্য্যাৎ কেশসংস্কারং গাত্রসংস্কারমেবচ।
কেশবেণী জটারূপং তৎক্ষৌর তীর্থকং বিনা।
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত নহি পশ্যতি দর্পণং।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রা নৃত্যং মহোৎসবং।
নর্ত্তকং গায়নঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং শুভং॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৮৩ অধ্যায়।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

উপরে ব্রহ্মচর্য্যের যে—লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে এই সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মৈথুনবর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য এবং তৈলতাম্বুলাদি পরিত্যাগ একাহার গাত্র ও কেশাদি অসংস্কৃত অবস্থায় রাখা বিলাসব্যঞ্জকবিষয় পরিহার ইত্যাদি, এ গুলি উহার উপলক্ষ্য। উপলক্ষ্য ব্যতীত যেমন কোন লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ মৈথুনোদ্দীপক পদার্থের বা বিষয়ের সংস্রব পরিত্যাগ ভিন্ন মৈথুনবর্জ্জন করা যাইতে পারে না। পাছে ঐ সকলের সংস্রবে শরীর মন উত্তেজিত হইয়া রিপু বিশেষ বলবতী হইয়া উঠে এবং তাহা বলবতী হইলে মৈথুনবর্জ্জন অসাধ্য হইয়া উঠে, সেই জন্যই বিচক্ষণ শাস্ত্রকারেরা ঐ সকলের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আবার পাছে ইহাতে শৈথিল্য বা অবহেলা প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল নিয়ম পালন না করে, সেই হেতু তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ নরকের প্রলোভন ও বিভীষিকা দেখাইয়াছেন। ইহাতে দেখা গেল ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃতার্থ মৈথুনবর্জ্জন। যদি ইহাতে কাহারও সংশয় থাকে তাহা হইলে আমরা অন্য দিক দিয়াও প্রতিপন্ন করিতে পারি যে, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের যথার্থ অর্থ। পাতঞ্জলদর্শন যোগশাস্ত্র, তাহাতে যোগতত্ত্বের কথা সুন্দর রূপে লিখিত আছে। যোগের অষ্ট অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে যম একটি। সেই যম আবার সত্য ব্রহ্মচর্য্য অহিংসাদি

পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের প্রকৃতার্থ যে শুক্রে ধারণ বা মৈথুনবর্জ্জন তাহা উক্ত দর্শনের সাধনপাদে বিবৃত আছে। যথা

"অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমা" অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটির নাম যম। টীকাকার বলিতেছেন "বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্। অস্যোপায়স্তুষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগঃ।" ইত্যাদি। বীর্য্যধারণ এবং মৈথুনবর্জ্জন এ উভয়ই এক কথা, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মহর্ষি দক্ষও ব্রহ্মচর্য্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। যথা

"এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গম্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্ট লক্ষণম্" ॥

অর্থাৎ এই আট প্রকারকে পণ্ডিতেরা মৈথুনের অষ্টাঙ্গ কহিয়া থাকেন এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মৈথুনবর্জ্জনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। মহর্ষি দক্ষের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকারের ও অর্থের একতা দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ যে মৈথুন পরিত্যাগ তাহা হিন্দুশাস্ত্রের একান্ত অভিপ্রায়। মৈথুনাভিলাষ মানবমনে উদিত হয় কিরূপে? রিপুর উত্তেজনায়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, যদ্যপি রিপু দমন করিয়া থাকা যায়, তাহাহইলেত আর মৈথুনেচ্ছা আসিতে পারে না। অতএব রিপুদমনই মৈথুনবর্জ্জনের

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

মূল। তাহা হইলে মৈথুনবর্জ্জন করিয়া থাকাও যা, রিপুদমন করিয়া থাকাও তাই, সুতরাং রিপুদমন বা মৈথুন-বর্জ্জন এ উভয়ই এক কথা। (আবার ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ যদি মৈথুনবর্জ্জন হইল তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থও রিপুদমন। এখন পাঠক মহাশয় দেখুন, বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে ইহার অর্থ কি এই নয়? যে বিধবাকে রিপু দমন করিয়া থাকিতে হইবে, অথবা বিধবাকে বিধবা হইয়াই থাকিতে হইবে।) যদি বলেন তা নয় বেশীর ভাগ আছে বই কি? ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে তীর্থ যাত্রা দান তর্পণাদি করিতে হয়; কেন? এ সকল কার্য্যত হিন্দুনারী বয়স্থা হইয়া অবধিই করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন; তবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বিশেষ আর কি করা হইল। সুতরাং বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন আর বৈধব্যাবস্থায় অবস্থান এ উভয়ই এক ব্যাপার। ইহাই যদ্যপি হইল তবে আর ব্রহ্মচর্য্যের স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থার অবতারণা করারত কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখি না। বিধবার বৈধব্যাবস্থায় থাকিলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হইল। তাহা হইলে আর আমাদিগকে এখন ব্রহ্মচর্য্য সকাম কি নিষ্কাম তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইতেছে না। কিন্তু তাহাতেও আমরা বিমুখ নহি। অতি বিষদভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মও নয়, নিষ্কাম কর্ম্মও নয়। পূর্ব্বে উক্ত

হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য ও রিপুদমন উভয়ই এক। যাহা হউক ধর্ম্ম কি এ বিষয় এখন আমাদিগকে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিইবা ধর্ম্ম কিইবা অধর্ম্ম, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে যাইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, কিন্তু এখন আমরা বাহুল্যের দিকে না গিয়া সূক্ষ্মভাবে ইহার প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করিব। ধৃঙ্ ধাতুর অবস্থানে মন্ প্রত্যয় করিয়া যদ্যপী 'ধর্ম্ম' পদ সিদ্ধ হয়, তাহাহইলে ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃতার্থ ইহা যে, যাহা না থাকিলে বস্তুর বস্তুত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ যাহা বস্তুর বস্তুত্ব বা প্রকৃতি তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দে যদ্যপী ইহাই বুঝায় তবে আমরা বলি ঈশ্বরপ্রীতিই মানবের ধর্ম্ম। কারণ ঈশ্বর প্রীতি ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না; ইহা কল্পনার কথা নয় কিন্তু পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য। ঈশ্বরপ্রীতি ধর্ম্ম হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা রিপুদমনকে কখন ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য রিপুদমন, সত্যকথন, তপস্যা ইত্যাদি সাধন অবলম্বন করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া রিপুদমনের নাম কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে তিন প্রকার তপস্যার বিধি দিয়াছেন—শারীরিক, মানসিক এবং বাচিক। চিত্তপ্রসাদ আত্মনিগ্রহ প্রভৃতির নাম মানসিক তপস্যা, সত্যকথন, প্রিয়বাক্য, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি বাচিক এবং অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির নাম শারীরিক তপস্যা। মহাভারত

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

প্রণেতা ব্রহ্মচর্য্যকে শারীরিকতপ নামে উক্ত করিয়াছেন। যথা

"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরংতপউচ্যতে।"

মোক্ষধর্ম্ম।

একাহার ভূমিশয্যা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন অর্থাৎ রিপুদমন করিয়া থাকিতে হয়, বোধ হয় সেই জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের নাম শারীরিক তপস্যা হইবে। যাহাহউক এই যে ত্রিবিধ তপস্যা, শাস্ত্রে ইহাদের অন্য নামও লক্ষিত হয়। যথা কায়দণ্ড, মনোদণ্ড এবং বাক্‌দণ্ড, দণ্ড শব্দের অর্থ শাসন। যদ্দ্বারা শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করা যায় তাহার নাম কায়দণ্ড অথবা শারীরিকতপস্যা ইত্যাদি। এখন প্রতিপন্ন হইল, ব্রহ্মচর্য্য, মৈথুনবর্জ্জন, রিপুদমন, শারীরিক তপস্যা বা কায়দণ্ড এইসকল শব্দ একপর্য্যায় ভুক্ত এবং একেরই বোধক। পথ পর্য্যটন না করিলে যেমন তীর্থধামে উপনীত হওয়া যায় না, সেইরূপ রিপুদমন সত্যকথন অহিংসা প্রভৃতি সাধনমার্গ অতিক্রম না করিলে ধর্ম্মরূপ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারা যায় না। আবার পথ পর্য্যটন না করিলে তীর্থদর্শন হয় না বলিয়া, যেমন পথ পরিভ্রমণের নাম তীর্থ দর্শন নহে; সেইরূপ বিনা সাধনে ধর্ম্ম লাভ হয় না বলিয়া, সাধনের নাম কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। পথভ্রমণ এবং তীর্থদর্শন যেমন এককথা নহে,

ভিন্ন, সেইরূপ সাধন এবং ধর্ম্মও উভয়ে ভিন্ন। তবে একটী অপরটীর সাপেক্ষ। সাধন ধর্ম্মরূপ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়, রাস্তা, সাধন ধর্ম্মরূপ দুর্ভেদ্য লক্ষ্যের উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, সেইরূপ সাধন এবং ধর্ম্ম ও পৃথক পৃথক। ব্রহ্মচর্য্য বা রিপুদমনের নাম সাধন সুতরাং ইহা উপলক্ষ্য। এক্ষণে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে ব্রহ্মচর্য্য বা রিপুদমন ধর্ম্ম নহে। সুতরাং যেখানে ধর্ম্মই নাহি, সেখানে সকাম ধর্ম্ম কি নিষ্কাম ধর্ম্ম তাহা দেখাইবার আর আবশ্যকতা নাই। এখন দেখিতে হইবে যে বিধবার পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম কর্ম্ম কি না? কেহ কেহ মহাত্মা রামমোহন রায় প্রণীত সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্কামত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত, রামমোহন রায় তৎপ্রণীত প্রবন্ধে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের আলোচ্য বিষয় সুবোধ্য হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম নিষ্কাম এবং মুক্তি সাধন হইতে পারে না, এরূপ কথন অতি আশ্চর্য্যকর। যেহেতু কি ব্রহ্মচর্য্য কি অন্য কোন কর্ম্ম, তাহাকে কামনা পূর্ব্বক করা কি কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক করা, ইহা কর্ত্তার অধীন হয়। কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে স্বর্গ ভোগ নিমিত্ত করে, আর কোন ব্যক্তি কামনায়

"ত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তি পদকে প্রাপ্ত হয়; অতএব বিধবা যদি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কামনা রহিত হইয়া করে, তথাপি তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না, এরূপ প্রত্যক্ষের এবং শাস্ত্রের অপলাপ করা × × × × কদাপি কর্ত্তব্য নহে। × × × অতএব ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফল কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মকে কাম্য কহা যায়, সে কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনু

"ইহচামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।"

কি ইহলোক কি পরলোকবাঞ্ছিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্ম্ম তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম্ম। × × × বিশেষতঃ ঐ মনুর শ্লোকের টীকাতে কুল্লুকভট্ট লিখেন যে সনক বালখিল্য প্রভৃতির ন্যায় বিধবারা স্বর্গে গমন করেন, অতএব সিদ্ধমুনিদের তুল্য পদ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য বিনা হইতে পারে না, এই হেতু এখানে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্যে তাৎপর্য্য হইতেছে"। † মহাত্মা ইহার সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত অংশ হইতে আমরা এই কয়টী কথা প্রাপ্ত হইতেছি। (১) ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফল কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই কাম্যকর্ম্ম, (২) এরূপ কামনা পূর্ব্বক করা

† শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থাবলীর সহমরণ বিষয়ক প্রবন্ধের ১৯২—১৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

আর না করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন হয়, (৩) নিষ্কাম ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সনক, বালখিল্যাদি নিত্যমুক্তদিগের ন্যায় মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, (৪) সুতরাং সনক বালখিল্যাদি নিত্যমুক্তদিগের তুল্যপদ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্কাম ভিন্ন সকাম ব্রহ্মচর্য্যে হইতে পারে না; (৫) অতএব ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম। সূক্ষ্মভাবে চিন্তাকরিয়া দেখিলে এই কথা গুলির পূর্ব্বাপর মিল আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ কামনা বিহীন হইয়া বা সকাম ভাবে কার্য্য করা যদ্যপী কর্ত্তার অধীন হয়, তাহা হইলে যে বিধবা নারী কামনার সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যত সকাম এবং সেরূপ করাওত সম্ভব, কেন না সকলেইত আর কিছু নিষ্কামপ্রিয় নয়; তবে একেবারে ব্রহ্মচর্য্যকে নিষ্কাম বলিয়া উল্লেখ করা এবং তাহাতে নিষ্কামজনিত ফলের অরোপ করাত কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করি না। কামনা করা বা না করা যেখানে কর্ত্তার অভিপ্রেত, সেখানে তাহার ক্রিয়াকে একেবারে নিষ্কাম বলা কখন উচিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ দেখা উচিত যে, বিধবানারী ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিত্যমুক্তের তুল্য পদ প্রাপ্ত হয়, ইহা সম্পূর্ণ অলীক কথা। ব্রহ্মচর্য্য বা মৈথুনবর্জ্জন মুক্তির হেতু হইতে পারে ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই বিরুদ্ধ। রিপুদমন করিয়া থাকিলে যদি সুদুর্লভ মুক্তিপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে মুক্তির গৌরব

এবং মাহাত্ম্য কিছুই থাকে না। ব্রহ্মচর্য্য কি নিমিত্ত মুক্তির কারণ হইতে পারে না, তাহার বিস্তারিত মীমাংসা এ স্থলে অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলিতে পারে যে, সকল প্রকার পাপ এবং দুর্ব্বলতা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত ভূমা পরমেশ্বরের সহিত মিলনের নাম যদ্যপী মুক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা কখন ভূমিতে শয়ন বা তৈল তাম্বুলাদি পরিবর্জ্জন; কিম্বা কোনরূপে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতে কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, তবে টীকাকার কুল্লুকভট্ট একথা লিখিলেন কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে, ইহা ব্রহ্মচর্য্যের স্তুতিবাদ বা প্রশংসাবাদ ভিন্ন কিছুই নহে। এবং শাস্ত্রে অনেক বিষয়ে এরূপ প্রশংসাবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়ত—ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম হইতে পারেনা একেবারেই সকাম, ইহার প্রমাণ স্থলে আমরা ব্রহ্মচর্য্যকেই উপস্থিত করিতেছি। ব্রহ্মচর্য্যই উহার সকামত্বের নিয়ামক; উহা নিজেই অনুষ্ঠাতার মনে কামনার উদ্রেক করিয়া দিতেছে। কারণ রোরুদ্যমানা হতভাগিনী বিধবানারী যখন গৃহে আসিল, তখন সে দেখিল তাহার সম্মুখে দুইটী পথ প্রসারিত। ব্রহ্মচর্য্যই যদ্যপী শ্রেষ্ঠতর পথ হয়, তবে সেই পথে পিতা দাঁড়াইয়া শাস্ত্র হস্তে দেশাচারের দণ্ড লইয়া বলিতেছেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা নারী লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।"

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

"অয়ি বিধবা কন্যে। যে নারী পতির মৃত্যু পরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে সে স্বর্গ লাভ করে" অতএব তুমি এই পথ অবলম্বন কর। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, সেই মুহূর্ত্তে কি তাহার অন্তঃকরণে কামনার বীজ অঙ্কুরিতে করিয়া দেওয়া হইল না? সে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে কেন? সে যদ্যপী শুনিল যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে স্বর্গলাভ হয় এবং তাহা শুনিয়া সে যখন তৎপালনে প্রবৃত্ত হইল, তখন যদ্যপী কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, হে নারি! তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন কর কেন? তাহা হইলে কি তাহার হৃদয় হইতে এই উত্তর উত্থাপিত হইবে না যে, "আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করি স্বর্গলাভের জন্য।" স্বর্গলাভের জন্য যদি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তবে স্বর্গ লাভটা কি একটা কামনার মধ্যে নয়? ব্রহ্মচর্য্য যে নিজেই কামনার প্রেরয়িতা, তাহার আরও প্রমাণ পাইবেন। না হয় ধরিলাম যে বিধবা রমণী নিষ্কামভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিল। অবলম্বন করিয়া যথারীতি নিয়ম প্রণালী সকল প্রতিপালন করিতে করিতে দেখিল যে একস্থানে রহিয়াছে।

"যানামারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ যানারোহণ করিলে বিধবা নরকে গমন করে। যখন সে ইহা জানিতে পারিল, তখন যানারোহণ পরিত্যাগ করিল। কেন না যানে আরোহণ করিলে নরকে গমন করিতে হইবে। করিলে—যদ্যপী নরকে যাইতে হয়, তবে না করিলে

কি হইবে? যে কায করিলে নরক ভোগ, তবে সে কায না করিলে কি স্বর্গ ভোগ নয়? যাহা করিলে নরক, তাহা না করিলে স্বর্গ ইহা শাস্ত্রও যুক্তি উভয়েরই অনুমোদিত। সুতরাং এখানেও বিধবার অন্তরে স্বর্গ ভোগের কামনা সঞ্চারিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রবেশদ্বারে প্রলোভন, পথে যাইতে যাইতেও প্রলোভন; প্রলোভন কামনার উত্তেজক। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য প্রথমেই অনুষ্ঠাতার মনে কামনার বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিতেছে এবং পাছে আসিতে আসিতে তাহার অন্তরে শৈথিল্য উপস্থিত হয়, সেই জন্য পথি মধ্যেও কামনাকে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ সকাম। ব্রহ্মচর্য্য যে সকাম ভিন্ন নিষ্কাম হইতে পারে না তাহার আরও একটি কারণ আছে। মনু পরাশর বিষ্ণু প্রভৃতি সকল সংহিতাকারেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফল স্বর্গলাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য স্বর্গফলসাধক ক্রিয়া, এবং স্বর্গফলসাধক কার্য্য মাত্রেই সকাম। যেহেতু গীতাতে ভূয়োভূয় উল্লেখ আছে যে "কামনাপরায়ণ ব্যক্তিরা কামনার বশীভূত হইয়া যে কার্য্য করে, তাহা দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ ভিন্ন আর কিছুই হয় না।" স্বর্গলাভ যখন সকামীদিগেরই কর্ম্মফলের পুরস্কার ভিন্ন আর কিছুই না হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা যদি সেই স্বর্গ লাভ হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য যে সকাম কার্য্য তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

এ স্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, না হয় নিষ্কামই নাই হইল, তাহাতে আর ক্ষতি কি, কিন্তু উহাতে যখন স্বর্গ লাভ হয় তখন উহারই অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে স্বর্গ নামে কোনস্থান আছে কি না তাহাই সন্দেহস্থল; যে শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবার স্বর্গভোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আবার সেই শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় স্বর্গ নামে কোন স্থান নাই। যদিই থাকে এবং সেই স্বর্গ যদ্যপি পুণ্যাত্মা দিগের সুখোপ-ভোগের স্থান হয়, তবে ইহা অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর এমন কোন অনুষ্ঠান নাই যদ্দ্বারা সেই স্বর্গে গমন করা যাইতে পারা যায়। কোন না কোন উপায়ে রিপুবিশেষ দমন করিয়া থাকিতে পারিলেই যদ্যপি স্বর্গে বাস করা যায়, তবে নপুংসক বা কৃত্রিমনপুংসক যাহারা, তাহাদিগের জন্য ও স্বর্গের দ্বার অবারিত। আর এক কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যপালন আর বিধবার বিধবা হইয়া থাকা এ উভয়ই এক, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেই যদ্যপি স্বর্গলাভ হয় তবে বিধবারাও কেন না স্বর্গে যাইতে পারে? অত-এব নারীদিগের বিধবা হইবার যোগাড়টা শীঘ্র শীঘ্র দেখা উচিত, কারণ তাহা হইলেই স্বর্গলাভ হাতে হাতে। এখন দেখা গেল বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মও নয়, নিষ্কাম কর্ম্মও নয় এবং ইহাতে স্বর্গ প্রাপ্তিও হয় না। কেহ কেহ বলেন

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

"প্রবৃত্তিরেষা নারীণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

অর্থাৎ নারীদিগের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহাফল। বিবাহ প্রবৃত্তির কর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য নিবৃত্তির কর্ম্ম, অতএব বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা "বিবাহকে মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের মুখে বিবাহ প্রবৃত্তির কর্ম্ম এ কথা বলা কখনই শোভা পায় না। বিবাহ যদ্যপি মোক্ষলাভের হেতু হয়, তবে বিবাহ কখনই নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে পারে না। না হয় ধরিলাম যে বিবাহ প্রবৃত্তির কর্ম্ম বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি মনুষ্যের মনোগত ব্যাপার। আর সকল ব্যক্তিরই কিছু মানসিক প্রকৃতি সমান নহে। কাহার চিত্ত প্রবৃত্তির দিকে রত, কেহ বা নিবৃত্তি ভালবাসে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপরায়ণ তাহাকে নিবৃত্তির পথে আনয়ন করা, তোমার আমার জোর জবরদস্তি বা বক্তৃতাবাচালতার সাধ্য নহে; তাহা তাহার স্বাধীনতার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কেহ কাহাকেও বলপূর্ব্বক সন্ন্যাসী করিয়া গৃহের বাহির করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহার নিজের ইচ্ছা হয়। কেহ যদ্যপি প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, আর তুমি যদ্যপি তাহাকে নিবৃত্তির পথে ফিরাইবার জন্য হাজার চেষ্টা কর তবে তাহা নিষ্ফল। সমাজের শাসন বা উৎপীড়ন অত্যাচারের ভয়ে কাহাকেও কোন পথে লইয়া যাওয়া যায় না। আর যদিইবা কেহ নির্য্যাতনের ভয় বা পুরস্কারের প্রলোভনে পড়িয়া,

আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কর্য্যে প্রবৃত্ত হয়; তবে তাহাতে যে সুফল কখনই ফলে না, তাহার ভুরি ভুরি পরিচয় মানব জাতির ইতিহাস পৃষ্ঠে লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং যে বিধবা নারীর হৃদয় প্রবৃত্তিকে জয়লাভ করিতে না পারিয়া তাহার অনুগত হইয়াছে, তাহাকে তৎপথ অর্থাৎ বিবাহের পথ হইতে ফিরাইয়া—নিবৃত্তির পথে দাঁড়-করান অদূরদর্শীতা ও মূঢ়তার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তারপর দেখিতে হইবে সাংসারিক ব্যাপার হইতে বিমুক্ত হইয়া কায়মনে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে করার নামই যদ্যপি নিবৃত্তি হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্যের জন্য তাহা করা যাইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মচর্য্য যে ধর্ম্ম নহে তাহা ইতি পূর্ব্বে বিবৃত ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের অনুসরণ করা আর নিবৃত্তির পথ আশ্রয় করা এ দুই কখন এক কথা হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিলে ও নিবৃত্তির পথ গ্রহণ করা হয় না, যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম নয়। আর এক কথা বিধবার বৈধব্যাবস্থায় থাকাতেই নিবৃত্তির পথে থাকা হয়, কারণ বিধবার বিধবাবস্থায় থাকা আর ব্রহ্মচর্য্য পালন করা এ উভয়ে কিছু পার্থক্য নাই।

এতক্ষণ আমরা শাস্ত্রোল্লিখিত ব্রহ্মচর্য্যের মীমাংসায় প্রবৃত্ত ছিলাম এবং দেখাইলাম যে তাহা ধর্ম্মও নয়, নিষ্কাম কর্ম্ম মধ্যেও পরিগণিত নয়। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্যের যে বিকৃতার্থ ঘটিয়াছে, এক্ষণে

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। "হিন্দু নারীর সতীত্বের মূল মন্ত্র সোহং × × × হিন্দু নারীর সতীত্বের মূল মন্ত্র সেই একমেবাদ্বিতীয়ং × × হিন্দু নারী জানেন কেবল একং এবং অদ্বিতীয়ং, কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই এক চারিণী, সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী" †। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের এরূপ লক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু শাস্ত্রের বহির্ভূত। সুতরাং ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় বলিয়া বোধ করি না, কারণ হিন্দুসন্তান কখন শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এস্থলে প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের পরিচর্য্যার নামই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মের সেবাই যদি ব্রহ্মচর্য্য হয়, তবে বিধবা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিলে কি তাহা হয় না? প্রকৃত পক্ষে তাহাতেই ব্রহ্ম-চর্য্য হয়। দ্বিতীয়ত দেখা যাইতেছে লেখক এস্থলে ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ অর্থসঙ্গতি করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। লেখক বলিতেছেন বিধবার পতি ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন—অতএব সেই ব্রহ্মের সেবা করিলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন হইবে। ব্রহ্মে যদ্যপী বিলীন হইয়া থাকে তাহা হইলেত, কিন্তু যদি না হইয়া থাকে তখন উপায় কি? তাহার পক্ষে আর ব্রহ্মচর্য্য ঘটিল না। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা চারি প্রকার মুক্তির কথা নির্দ্দেশ করি-

---

† নবজীবন। ১১শ সংখ্যা। ৭০৪ পৃষ্ঠা।

য়াছেন, যথা সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি দিগেরই আত্মা মরণান্তে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখিতে হইবে, যে সকল নারীর স্বামী তপোবলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণরূপ পরমপদের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহারাই তাহাদের ভর্ত্তার মরণান্তে ব্রহ্মচর্য্য পালনের অধিকারী, নচেৎ অপর কেহ নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেরূপ তপোমার্জ্জিত দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত লোক হিন্দু সমাজে কয় জন আছেন? কয়জন হিন্দুনারীর স্বামী নির্ব্বাণ রূপ মুক্তির পদের অধিকারী? যদি তাহাই না থাকে জানিয়া থাক, তবে আর ব্রহ্মচর্য্যের এ ব্যভিচারার্থের উল্লেখ করা কেন? তৃতীয়ত—দেখিতে হইবে ব্রহ্মচর্য্যের এরূপ বিকৃতার্থ করিয়া একটি গুরুতর অনিষ্টের সূচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মলীন পতির সেবা অর্থাৎ ব্রহ্মের সেবা করিলেই যদ্যপি ব্রহ্মচর্য্য হয়, তবে হিন্দু নারী যেমন জানেন যে তাঁহার মৃতপতি ব্রহ্মে লীন হইয়াছে, সেইরূপ ইহাও জানেন যে আর ও কত লোকের মৃতপতি সেই অনন্ত ব্রহ্মে লীন হইয়াছে, তবে কি সেই বিধবা নারী ব্রহ্মের সেবা করিতে গিয়া কেবল আপন পতির সেবা করিতেছেন? না সেই সঙ্গে অনেকের পতির সেবা করিতেছেন? সুতরাং তিনি ব্রহ্মচারিণী হইলেই একচারিণী হইতেছেন না, কিন্তু বহুচারিণী হইয়া পড়িতেছেন! নিজ পতির সেবার সঙ্গে

অনেকের পতির সেবা হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ব্রহ্মচর্য্যত হিন্দুনারীর পক্ষে কখন অবলম্বনীয় হইতে পারে না। চতুর্থতঃ দেখুন, সোহহং "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি কথা সকল অদ্বৈতবাদীদিগের কথা। লেখক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য ঐ সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু অযোগ্য স্থলে ব্যবহৃত হওয়ায় পাণ্ডিত্যের বিপরীতভাবই প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা নারী যদ্যপি প্রকৃতপক্ষে "একমেবাদ্বিতীয়ং" মতের অনুসারিণী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে একাতিরিক্ত পদার্থ কিছুই নাই। সেই এক পদার্থ ব্রহ্ম; অপর সমুদায়ই অসত্য এবং মায়াময়, সুতরাং মিথ্যা দৃষ্টিমাত্র। যাহা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে বাস্তবিক সে সকল ভিন্ন নহে এক। এই যে আমি আমার সম্মুখে রাম হরি যদু তিনটি বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দেখিতেছি, বাস্তবিক তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নহে, একই ব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র। রামের পত্নী যদ্যপি প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাদিনী হন, তাহা হইলে তিনি অক্লেশেই বলিতে পারেন যে, আমি যেমন রামকে বিবাহ করিয়াছি, সেইরূপ যদু ও হরিকেও বিবাহ করিয়াছি ; কারণ রাম, হরি, যদু এ তিন ব্যক্তিই এক অতএব আমি একের পত্নী হইলেই তিনের পত্নী হওয়া হইল। সুতরাং সে স্ত্রী কখন রামের মৃত্যুতে বিধবা হইতে পারে না, কারণ তাহার আরও স্বামী বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতএব ব্রহ্মবাদিনীর অভিধানে কখন 'বৈধব্য' শব্দ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মবাদিনী যখন দেখিতেছে যে, এই নিখিল বিশ্বসংসারই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মময়, তখন তাঁহার পক্ষে বৈধব্যই কি, আর ব্রহ্মচর্য্যই বা কি? এক্ষণে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইল ব্রহ্মচর্য্যের এরূপ অর্থ যুক্তি ও কার্য্যত একান্ত গর্হিত। ব্রহ্মচর্য্যের এইরূপ নূতন একটা আজগুবি অর্থ করিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে যাওয়া, আর সমাজকে রসাতলে দেওয়া এ উভয়ই এক কথা। ইহারই নাম সংস্কারবিভ্রাট। যাহা হউক একজনের শাস্ত্র ও ও যুক্তি বিগর্হিত একটা সামান্য কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠক মহাশয় এখন সুনিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শাস্ত্রোল্লিখিত বিধবার যে ব্রহ্মচর্য্য তাহা ধর্ম্ম নয় এবং নিষ্কাম কর্ম্মও নয়। তাহাতে নিষ্কামত্বের বিন্দুবিসর্গও নাই—প্রত্যুত কামনায় আপদমস্তক জড়িত। সুতরাং যাহারা বিবাহকে কাম্যকর্ম্ম বলিয়া নিকৃষ্ট বোধে ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করেন তাহাদের সকল কথা একে একে খণ্ডন করা গেল। তাহারা যে সকল যুক্তির উপরে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছিলেন, সে সকল যুক্তি এখন অসার ও অলীক বলিয়া প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পবিত্রতর অনুষ্ঠান নয়। এইবারে প্রতিপন্ন হইবে যে বিবাহ

ব্রহ্মচর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং কল্যাণকর। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিষদভাবে দেখাইয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য রিপুদমন। বল পূর্ব্বক একাহার, উপবাস প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ক্লেশের দ্বারা শরীরকে কৃশ এবং নিস্তেজ করিয়া, তদ্দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে রিপুর শক্তিকে ক্ষীণ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে রিপুদমন হয় না। একটা পরাক্রান্ত জন্তুকে পিঞ্জরের ভিতরে বদ্ধ করিয়া অনাহারে বা প্রহারের দ্বারা কি কখন তাহাকে আপন বশে আনা যায়? যদি না তার ইচ্ছা থাকে। সেইরূপ উপবাস, অনিয়মিত আহার, ভূমিশয্যা প্রভৃতি বাহ্যিক উপায় দ্বারা তুমি কখন তোমার ইচ্ছাশক্তিকে নিরোধ করিতে পার না? বাহ্যিক উপায়ে ধরে-বেঁধে কখন রিপুদমন হয় না। বাহ্যিক উপায়ে রিপুদমন হয় না ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। এরূপ অনেক সংসারত্যাগী উদাসীন দেখা গিয়াছে, যাহারা বাহ্যিক বিবিধ প্রকার উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করিতে গিয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়াছে। একাহারাদি ক্লেশকর ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মানুষের শরীর ক্ষীণ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে যথার্থ বটে, এবং শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন মনের কুপ্রবৃত্তি সকলের শক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া থাকে তাহাও সত্য বটে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে রিপুদমন হয় না। সুতরাং বাহ্যিক উপায়ে রিপুদমন করিতে যাহারা

ব্যবস্থা দেন তাঁহারা ভ্রান্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারাও ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। উপায়ের দ্বারা যদ্যপী উদ্দেশ্য সাধন না হয়, তবে সে উপায়ের অনুষ্ঠান করা আর না করা একই। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন ব্রহ্মচর্য্যে বিধবার প্রতি যে যে কার্য্যের উল্লেখ আছে, তৎপালনে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে কি না? একাহার; ভূমিতলে শয়ন, শরীরাদি অসংস্কৃতাবস্থায় রাখা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হইতে বঞ্চিত থাকা নিবন্ধন কি হতভাগিনী বিধবার কলেবর শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য এবং অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়া আত্মহত্যাজনিত গুরুতর পাপে পতিত হয় না? আত্মহত্যা আবার কাহার নাম? উদ্বন্ধনে বা অবগাহনে প্রাণত্যাগের নাম যদ্যপী আত্মহত্যা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি জ্ঞান পূর্ব্বক ক্ষুধার সময় অনশনে যাপন করা, দুরন্ত শীতে ভূমিতলে শয়ন করতঃ শরীরকে অধিকতর শীতবাতে ব্যথিত করা এবং বিবিধ প্রকার ক্লেশকণ্টকে দেহকে বিদ্ধ হইতে দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখকর অসহ্য ঘটনাবলীর মধ্যে শরীরকে পতিত রাখিয়া, অসময়ে জীবনলীলা সম্বরণ করা কি আত্মহত্যা নয়? প্রচণ্ড নিদাঘের প্রখর তপনতাপিত মধ্যাহ্ন সময়ে তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠাগতপ্রাণ তোমার বিধবা কন্যা ছট্‌ফট্ করিতে

কাঁদিতে সামান্য জলগণ্ডুষের অভাবে লৌকিকীলীলা শেষ করিল, বল দেখি এ কি আত্মহত্যা নয়; তিথি বিশেষ বা দিবাবিশেষে রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া অভাগিনী বিধবানারী ঘৃণিত দেশাচারের ভয়ে শীর্ণ কণ্ঠে ঔষধ ঢালিতে সাহস করিল না; কিছুক্ষণ পরে দেখি দুরন্ত রোগ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া তাহার প্রাণকে দেহ মন্দির হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া চলিল, বল দেখি ইহার নাম কি আত্মহত্যা নয়? পৃথিবীর ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিত দিগকে জিজ্ঞাসা করি অকালে প্রাণত্যাগ করাকে কি অধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করেন না? যে দেহ জ্ঞান ও ধর্ম্ম কীর্ত্তি ও সুখ্যাতির অধিষ্ঠান মন্দিরস্বরূপ, অধিক কি যে দেহ সকল প্রকার শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের আধারক্ষেত্র, সেই দেহকে জ্ঞাতসারে অকর্ম্মণ্য ও অকালে নিপাতিত করা কি নিতান্ত নিন্দনীয় কর্ম্ম নয়? শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা কি বিশ্ববিধাতার একান্ত অভিপ্রেত নহে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার লঙ্ঘনে কি ঘোরতর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না?

কি ছার সে ব্রহ্মচর্য্য যাহার অনুষ্ঠানে যুগপৎ এত গুলি অনিষ্ট আসিয়া পড়ে, কি ছার সে ব্রহ্মচর্য্য যাহার যাতনায় বিধাতার প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়মাবলী অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়, তাই বলি ব্রহ্মচর্য্য নিন্দনীয়, ব্রহ্মচর্য্য নারীর একান্ত পরিহার্য্য, জন সমাজের অকল্যাণ

কর। সুতরাং আবার বলি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মও নয়, নিষ্কাম কর্ম্মও নয়, প্রত্যুত ঘোরতর অধর্ম্ম। এখন পাঠক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞসা করি, এই ব্রহ্মচর্য্য প্রথা প্রচলিত রাখিয়া ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন ও তজ্জনিত আত্মহত্যা রূপ প্রবল পাপস্রোতে হতভাগিনী বিধবাদিগকে নিক্ষিপ্ত করা উচিত? না অন্য পথে তাহাদিগের জীবনকে পরিচালিত হইতে দেওয়া উচিত।

বিবাহ কুলের সহিত না ব্যক্তির সহিত?

২য়। হিন্দুনারীর বিবাহ ব্যক্তির সহিত নহে, কুলের সহিত সুতরাং পতি বিয়োগে স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে না, কারণ কুলত্যাগে কুলটা। "হিন্দুর বিবাহে দুইটি তারা দেখিতে হয় একটি অরুন্ধতি আর একটি ধ্রুব তারা। অরুন্ধতীকে সাক্ষি করিয়া আদর্শ করিয়া কন্যা বলেন "হে অরুন্ধতি আমি যেন তোমার মত পতিতে আবদ্ধ থাকি। ××× এই পরিভ্রাম্যমান জগতের মধ্যে একমাত্র অচল অটল পদার্থ ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষি করিয়া হিন্দুনারা বলিয়াছেন—"ধ্রুবমসি, ধ্রুবাহং। পতিকুলে ভূয়াসম্। আমি যেন পতিকুলে অচলা হই।" তবে আজি

কোন্ প্রাণে সেই পতিকুল ত্যাগ করিবেন"? † অতএব হিন্দু বিধবার বিবাহ অসিদ্ধ। এ আপত্তিটি কিছু আপাত গ্রাহ্য বটে। প্রথম দেখিতে হইবে 'ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং' ইত্যাদি মন্ত্র বিবাহের পরিশিষ্ট স্বরূপ কুশণ্ডিকা প্রকরণে আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির এই কুশণ্ডিকা হয় না, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয় বিবাহিত কন্যারা এই প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণেতর জাতির বিধবা কন্যার বিবাহে এ আপত্তি টিকিল না। অতএব পরোক্ষ ভাবে লেখকের স্বীকার করা হইল যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণস্থ বিধবা নারীর বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত। এবং ইহাও স্বীকার করা হইল যে, যে কন্যার বিবাহানুষ্ঠানে এই মন্ত্র পঠিত হইবে না, পতির পরলোকান্তে তাহার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রতঃ অনিবার্য্য। দ্বিতীয়তঃ—দেখিতে হইবে প্রতিজ্ঞা কিরূপ স্থলে মূল্যবান হয়; প্রবীণ লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, যদি কেহ তাঁহার দশমবর্ষীয়া বালিকা কন্যাকে আসিয়া বলে যে তুমি বল "I will surely murder my father," অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আমার পিতাকে খুন করিব। অবোধ বালিকা সে কিছুই বোঝে না, ইংরাজি জানে না, সে অস্পষ্ট ভাবে কোন না কোনরূপে ঐ কথাগুলি বলিল; এখন সরল ভাবে বলুন দেখি যে, আপনি আপনার কন্যার হস্তে নিহত

---

† নবজীবন। ১১ শ সংখ্যা। ৬৯৮—৬৯৯।

হইবেন কি না? কন্যার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি আপনি তাহাকে বলিবেন যে, হে কন্যে! এই লও তরবারি লইয়া আমার কণ্ঠচ্ছেদ কর, কারণ বোঝ আর না বোঝ যখন তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। এখন বলুন দেখি এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞার মূল্য আছে কি না? তাহার পর লেখকের বোধ হয় অপরিজ্ঞাত নাই যে, কুলীর দালালেরা কিরূপে কৌশল পূর্ব্বক অশিক্ষিত কুলীদিগকে আসামে লইয়া যায়। দালালেরা নির্ব্বোধ কুলীদিগকে শিখাইয়া আনে যে, "দেখ্ সাহেব তোকে যা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তাহাতেই তুই হ্যাঁ বল্‌বি।" যথা সময়ে হতভাগ্য কুলী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেব বাহাদুরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিল "কেমন তুই চা-বাগানে যাইবি?" উত্তর "হ্যাঁ," তার পর সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করিল "সেখানে তোকে দশ বৎসর থাকিতে হইবে, কেমন থাকিবি?" উত্তর হইল "হ্যাঁ," তারপর সাহেব বলিলেন "কেমন তুই স্বইচ্ছায় সেখানে যাইতেছিস্" উত্তর করিল "হ্যাঁ", সে বর্ব্বর জানিল না যে, সে তাহার কি সর্ব্বনাশ করিল। তখন তাহাকে জাহাজে বদ্ধ করিয়া আসামে চালান দিল। তথায় পশুপ্রকৃতি সাহেবের অত্যাচার প্রহারে এবং বিবিধ প্রকার ক্লেশে চক্ষের জল দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, কি ভীষণ ব্যাপারে সম্মতি দান করিয়াছিল। আবার বলুন দেখি এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞার মূল্য আছে

কি না? সেইরূপ অবোধ কন্যাকে বিবাহস্থলে পুরোহিত বলিতে লাগিল যে বল, "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং! পতিকুলে ভূয়াসম্॥" কন্যা অর্দ্ধস্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে তাহাই বলিল। কিন্তু সে জানিতে পারিল না যে, কি কথা বলিতেছি এবং তাহার অর্থ কি? সে জানিল না, এ কথার উপরে আমার জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে কি না? প্রতিজ্ঞা 'জ্ঞা'ধাতুনিষ্পন্নপদ। জ্ঞা-ধাতুর অর্থ জানা, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া, বুদ্ধি বিবেকের সহিত বিচার করিয়া যদি কোন কথায় সম্মতি দান করা যায়, তবেই প্রতিজ্ঞা হইল। নচেৎ মন বুঝিতে পারিল না যে, আমি কি বলিতেছি; হৃদয় জানিল না, আমি কি করিতেছি; বিবেক সায় দিল না তাহাতে, আমি যাহা বলিতেছি; আমি যে জিনিস সে জানলে না আমি কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কেবল রসনার একটু অস্ফুটধ্বনি হইল অমনি সমাজধুরন্ধর কোথায় ছিলেন, লাফাইয়া আসিয়া বলিলেন "কন্যে! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, আমি পতিকুলে অচলা থাকিব। তবে যে আবার বিবাহ করিতে চাও"! কি সর্ব্বনাশ! এইরূপ অর্ব্বাচীনদিগের প্রভুত্বেই জন সমাজ শান্তি শৃঙ্খলা বিহীন হইয়া পড়ে। কন্যা সে কিছুই জানে না যে, আমি পতিকুলে অচলা কি সচলা; অথচ সমাজসংস্কারক বলিতেছেন "তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ।" আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যে, বিবাহ স্থলে কন্যাকে

ঐসকল কথা না বলাইয়া, যদি বলান হইত যে "পতিত্যাজ্যা পতির্বধ্য" তাহা হইলে কি আপনারা বলিতেন "নারী তুমি তোমার পতিকে বধ কর, ত্যাগ কর"। এখন বোধ হয় পাঠক মহাশয়! বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞা কোন কার্য্যেরই নহে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, নারী যদ্যপি শিক্ষিতা হন, সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞা হন, তাহা হইলেত তিনি জানিয়া শুনিয়া সে কথা বলিয়াছেন, সুতরাং সে স্থলে তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহার পক্ষে বৈধব্যাবস্থায় পরিণয়ার্থী হওয়া কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। পতিকুল হইতে বিচ্যুত হওয়াই না হয়, তাঁহার পক্ষে অন্যায়, কিন্তু যদি তিনি পতিকুলের অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন, তাহা হইলেত তাঁহাকে আর পতিকুল হইতে বিচ্যুত হইতে হইতেছে না। তিনি পতিকুলে স্থায়ী রহিলেন। আর এক কথা বলি যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন যে, 'পতিকুলে ভূয়াসম্' ইত্যাদি মন্ত্র প্রকৃত পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত কি না? নারীর বিবাহ পতির সহিত, না পতিকুলের সহিত? যাঁহারা বলেন "আত্মায় আত্মায় মিলনের নামই বিবাহ" তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি অকপটভাবে বলুন দেখি যে, এক জন পুরুষের সহিত একজন নারীর আত্মার মিলন হইয়া পরস্পরের বিবাহ হইল; এখন সেই বিবাহিত নারীর সহিত

তাহার স্বামীর আত্মার মিলন হইয়াছে বলিয়া কি, স্বামীকুল সংস্পৃষ্ট যাবতীয় পুরুষের সহিতই সেই নবোঢ়া কামিনীর প্রাণে প্রাণে আত্মায় আত্মায় মিলন হইয়া গেল? যদি বলেন তাহা কি কখন হইতে পারে? একজন পরিনীতা নারীর সহিত কি কখন তাহার পতিকুলের সমস্ত ব্যক্তির আত্মায় আত্মায় প্রাণে প্রাণে মিলন হইতে পারে? যদ্যপী না হয়, তবে স্বীকার করুন যে, আত্মায় আত্মায় মিলনের নাম বিবাহ নহে। যিনি এ কথা সমর্থন করিতে অক্ষম তাঁহার পক্ষে 'পতিকুলে ভূয়াসম্' ইত্যাদি বচন উদ্ধার দ্বারা বিধবা বিবাহের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া চিত্তের লঘুতা এবং অসারতা প্রকাশ বই আর কিছুই নহে। আর একদিক দিয়া দেখিলে, এ বিষয় আরও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইবে। মনে করুন রামের সহিত কোন নারীর বিবাহ হইল, তাহা হইলে রামের কুলস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিতই সেই নারীর বিবাহ হইল, অতএব রাম যেমন সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে, অপরাপর ব্যক্তিরাও সেইরূপ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। সুতরাং রামের গোষ্ঠীয় অপরাপর ব্যক্তির আর বিবাহের আবশ্যকতা রহিল না, এবং রামের মৃত্যু হইলেও সে নারী আর বিধবা হইতেছে না, কারণ তাহার অন্যান্য স্বামী বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন আপনারা কি এরূপ অবস্থার সমর্থন করেন? বিবাহ ব্যক্তিগত না হইয়া কুলগত হইলে এইরূপ ঘোর নিন্দনীয়

অনর্থকর দৃশ্য উপস্থিত হয়। (লেখক মহাশয়ের মতে যদ্যপি বিবাহ ব্যক্তিগত না হইয়া কুলগত হয়, তাহা হইলে নারদ বিষ্ণু প্রভৃতি জ্ঞানাপন্ন সংহিতাকারেরা লেখকের নিকট ভ্রান্ত অথবা অভিজ্ঞতাংশে কিঞ্চিৎ হীন, কারণ প্রায় সকল সংহিতাকারেরাই পতির মৃত্যু ভিন্ন অন্যান্য স্থলে নারীদিগের পুনঃপরিণয়ের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। যদি কুলের সহিত বিবাহই বাস্তবিক বিবাহ হয় এবং কুলত্যাগে কুলটা হয়,—তাহা হইলে জ্ঞাতসারে কেন সেই শাস্ত্রকারেরা নারীদিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কুলত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মপথে আনয়ন করিতেছেন? অনেকে হয়ত জানেন যে, এমন অনেক বিবাহিত রমণী পুরাকালে এই দেশে ছিল এবং এখনও রহিয়াছে, যাহারা সাংসারিক সুখভোগকে অকিঞ্চিৎকর অসার মনে করিয়া তাহা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক উদাসীনভাবে নির্জ্জন স্থানে গিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহারা যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে তখন অবশ্যই কুলত্যাগ করিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এখন এই ধর্ম্মপরায়ণা পবিত্র চরিত্রা নারীদিগকে কি আপনি 'কুলটা' রূপ ঘৃণিত ভাষায় অভিহিত করিতে পারেন? এখন বিশেষ ভাবে বুঝা গেল, নারীর বিবাহ কেবল মাত্র পতিরই সহিত, পতিকুলের সহিত নহে। কুলটা শব্দের প্রকৃতার্থ বোধ হয়, ইহা নহে যে, যে কুলকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু যে নারী

স্বীয় চরিত্রগত কলঙ্ক বা অন্য কোন অপরাধ জন্য কুল কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন, তিনিই কুলটা।)

আত্মা অমর অতএব বিধবা, পতির আত্মার ধ্যান করিবে।

৩য়। "হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাহার আত্মার ধ্বংস হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতিধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দু নারী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে? তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলেতো, উঁহার পুনর্ব্বার বিবাহের দাবি চলিবে"* । বেশ কথা স্বীকার করিলাম যে আত্মা অবিনাশী এবং সেই অক্ষয় অবিনাশী আত্মার ধ্যান ও চিন্তনে বিধবা কালাতিপাত করিবে। আত্মা যদ্যপী অবিনাশী হয় এবং নারী জাতি যদি আত্মাসম্পান্ন হয়, তাহা হইলে নারীর আত্মা ও অবিনাশী অমর; পতির আত্মার চিন্তনের বিধি যদি নারীকে প্রদান কর, তবে স্ত্রীবিয়োগ হইলে তাহার পরলোকগত আত্মাব ধ্যানের ব্যবস্থা কেন না পুরুষকে দিয়া থাক? মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতেই যদ্যপী তাহার ধ্বংস না হয় তবে স্ত্রীর অশৌচান্ত না হইতে হইতেই

---

* নব জীবন। ১১ সংখ্যা। ৬৯৯ পৃষ্ঠা।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠ? যদি বল পুরুষের ও অন্য বিবাহ না করিয়া স্ত্রীর পরলোকবাসী আত্মার ধ্যান মননে কালাতিপাত করা উচিত। যদ্যপী উচিত হয় তবে পুরুষদিগের মধ্যে এই কর্ত্তব্যের আদেশ প্রচার না করিয়া নারী জাতির প্রতিই এত কঠোরতা কেন? হিন্দু যেমন আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন, সেইরূপ পূর্ব্বজন্ম পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এখন যিনি নারী, পূর্ব্বজন্মেও অবশ্য তিনি একজন নারী ছিলেন, বিবাহিতাও ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পতি এখন ও জীবিত এবং বর্ত্তমান, কারণ আত্মার বিনাশ নাই ক্ষয় নাই, তবে কিরূপে তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহিত করিবার জন্য উদ্যত হও? সুতরাং নারীর আদৌ বিবাহই হইতে পারে না। সেইরূপ অপর-দিকে দেখিলেও পুরুষের বিবাহ হইতে পারে না। কেন না এখন যিনি পুরুষ, তিনি পূর্ব্ব জন্মেও পুরুষ ছিলেন এবং বিবাহিতাও ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী এখন জীবিত, কারণ আত্মা অবিনাশী, তাহা হইলে পত্নী সত্বেও কিরূপে তিনি অপর নারীর পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইতে পারেন? আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, বিধবা বিবাহের অযৌক্তি-কতা প্রতিপাদন করিতে যাওয়া, নিতান্ত যুক্তি ও শাস্ত্র বিগর্হিত ব্যাপার। আত্মা জরামরণ রহিত সুতরাং বিধবার পতি জীবিত বিদেশগত, অতএব বিধবাবিবাহ

অসিদ্ধ, ইহা যদি বলিতে চাও, তবে জনসমাজ হইতে এককালে বিবাহরীতি রহিত করিয়া দাও। কারণ প্রত্যেক নর নারীর পতি এবং পত্নী পরলোক অথবা অন্য কোন প্রদেশে জীবিত ও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চির কাল থাকিবে। বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, লেখক মহাশয় যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া বিধবা বিবাহ প্রথা রহিত করিতে যাইতেছিলেন, এখন আপনি শুদ্ধ সকলেই সেই ফাঁদে পড়িয়া এককালে বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। স্বপক্ষপরবশ হইয়া লেখক কি সর্ব্বনাশের সূচনাই করিতে যাইতেছেন এই ভয়ানক কথা প্রচার হইলে মানব-সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে এবং এক মহানর্থকর পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে।

পরাশর শ্লোকের অন্য অর্থ।

৪র্থ। (কেহ কেহ বলেন পরাশর যে "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি শ্লোকের প্রকটন দ্বারা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তাহা বিবাহের পর নহে কিন্তু বাগ্দানের পর; অর্থাৎ কোন নারীর সহিত কাহার ও বিবাহ বিষয়ে নিশ্চয় হইয়া বাগ্দান হইলে পর, যদ্যপি ঐ সকল ঘটনা উপস্থিত

হয়, তাহা হইলে অবিবাহিতা অথচ বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। মনু একবার মাত্র দানের বিধি দিয়াছেন এবং "বিহিতদানোত্তরগ্রহণস্যৈব বিবাহ পদার্থত্বাৎ" অর্থাৎ যথাবিধি দানের পর যে গ্রহণ তাহাই বিবাহ শব্দ বাচ্য, অতএব পুনরায় বিবাহ আর কিরূপে হইতে পারে। আমরা অগ্রে প্রথম কথাটির বিষয় আলোচনা করিব। পরাশর সংহিতার শ্লোকের তাৎপর্য্য যে বাগ্দানের পর নহে, কিন্তু বিবাহের পর, তাহা আমরা নারদ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। যথা।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ॥

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত স্থির হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ বিধেয়। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণজাতির স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে চারি বৎসর অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে। যদ্যপি কেবল বাগ্দানের স্থলেই পুনর্ব্বিবাহ বিধেয় হইত, তবে সন্তান না হওয়ার কথা এস্থলে আসিল কেন? সন্তান না হইলে এক নিয়ম এবং হইলে অন্য নিয়মের বিষয় যখন উল্লিখিত রহিয়াছে,

তখন বুঝিতে হইবে যে, সে স্ত্রী অবশ্য বিবাহিতা। যাহার কেবল মাত্র বাগ্দান হইয়াছে, বিবাহ হয় নাই, তাহার পক্ষে কখন সন্তান হওয়া না হওয়ার কথা আসিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে পরাশর সংহিতার শ্লোকের তাৎপর্য্য কন্যার বাগ্দানের পর নহে, কিন্তু বিবাহের পর। দ্বিতীয় কথাটীর বিষয় দেখিতে হইবে যে, বিধিমতে দান ও তারপর গ্রহণের নাম যদ্যপি বিবাহ হয়, তাহা হইলে গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই তিনপ্রকার বিবাহ, বিবাহ প্রণালীর মধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে না। কারণ গান্ধর্ব্ব বিবাহে দান গ্রহণের কোনরূপ সংস্রব নাই, তাহা কেবল বর কন্যার স্বেচ্ছানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ছেদ ভেদ ও বল পূর্ব্বক কন্যা পক্ষীয়দিগকে পরাভূত করিয়া কন্যা হরণের নাম রাক্ষস এবং মদিরামত্ত বা শয্যাশায়িত কন্যাকে ছল পূর্ব্বক হরণের নাম পৈশাচ বিবাহ ৭। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এই তিন প্রকার বিবাহ, বিবাহের প্রাগুক্ত সংজ্ঞাসিদ্ধ নয়, অথচ মনু এই তিন প্রকার বিবাহকে বিবাহ প্রণালীর মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এবং মনু প্রতিষ্ঠিত বিধি হিন্দু মাত্রেরই শিরোধার্য্য। তাহা হইলে বিবাহের পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা টিকিতেছে না। কিন্তু যদিই বিবাহের উপরি উক্ত সংজ্ঞা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ও পরে দেখিতে পাইবেন যে, বিবাহিত অর্থাৎ

---

৭ মনুসংহিতা। ৩ অধ্যায়।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

যথাবিধি দান ও গৃহীত কন্যাদিগের ও পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি শাস্ত্রকারেরা প্রদান করিয়াছেন। যথা—

সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা॥
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণ ভূষণা।

কাত্যায়ন।

অর্থাৎ যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছাচারী সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে ঊঢ়া অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া অন্য পাত্রে দান করিবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও দত্ত কন্যার পুনর্দ্দানের বিধি দিয়াছেন। যথা—

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরং স্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ কন্যাকে একবার দান করা যায়, দান করিয়া হরণ করিলে চোরদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু পূর্ব্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে, দত্ত কন্যাকেও পূর্ব্ব বর হইতে গ্রহণ করিবে অর্থাৎ তাঁহার সহিত বিবাহ না দিয়া শ্রেষ্ঠ বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে। যদিও কাত্যায়নের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের পুনর্ব্বিবাহের কারণ বিষয়ে ঐক্য হইতেছে না, কিন্তু উভয়েই বিবাহিত কন্যার পুনর্ব্বার

বিবাহ হয় এবং তাহা উচিত এ বিষয়ে এক বাক্যে সমর্থন করিতেছেন। কেহ হয়ত পুরাণ বিশেষের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে পারেন যে, এ সকল বিষয় সত্য ত্রেতাদি যুগের উপযুক্ত, কলিযুগের নয় কলিকালে নিষিদ্ধ, একালে বিবাহিত কন্যার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না। আমরা ইহার উত্তরে বলি যে, শাস্ত্রের কথাই যদ্যপী অধিকতর স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমরা শাস্ত্রের দ্বারাই দেখাইতে পারি, পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতি অধিকতর প্রামাণ্য এবং গ্রাহ্য। সুতরাং কোন বিষয় লইয়া পুরাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, স্মৃতির কথাই গ্রাহ্য। সুতরাং হিন্দু মাত্রেই বলিবেন বিবাহিত কন্যার পুনরায় বিবাহ দেওয়া যায়, কেননা তাহা শাস্ত্রানুমোদিত। আর যদ্যপী শাস্ত্রের প্রভুত্ব স্বীকার না কর, তাহা হইলে বলি, যে কথা যুক্তিভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, যাহার মূলে জনসমাজের কল্যাণকারিতা বিদ্যমান নাই, সেই অসার অকিঞ্চিৎকর কথার আবার মূল্য কি? শাস্ত্র যদ্যপী যুক্তিসাপেক্ষ হয়, তবে শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যুক্তির অনুসরণ করাই শ্রেয়কল্প। যাহা হউক এখন প্রতিপন্ন হইল যে, পরাশর সংহিতার বিধবা বিবাহ প্রতিপাদক যে শ্লোক, তাহা কন্যার বাগ্দানের পর নহে, কিন্তু বিবাহের পর, এবং দত্ত কন্যার পুনর্দ্দান ও শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ একান্ত অনুমোদিত।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

অন্যান্য সামান্য আপত্তি।

৫ম। কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন, বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইলে নারীরা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিবে, এবং আপন পতির প্রাণ হনন করিয়া, স্বীয় অভিমত স্বামীতে আসক্ত হইবে। এরূপ যদ্যপী বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার বটে, কিন্তু যদি না হয়, তবে আর এ অনিষ্ট কল্পনার আবশ্যকতা কি? এরূপ ঘটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব। কারণ স্বামীই যখন আপনার অনভিমত স্ত্রীকে বিনষ্ট করিয়া অন্য নারীর পাণি গ্রহণ করে না, তখন কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, অবলা পতিমুখাপেক্ষী কামিনীকুল আপন পতির প্রাণসংহার করিয়া অন্য পুরুষে অনুরক্ত হইবে। স্বামী যদি অনভিমত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিবার ত কোন কারণ দেখিতে পাই না, না হয় সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং স্থলবিশেষে শাস্ত্রকারেরা পরিত্যাগ করিবার অধিকারও নারীদিগকে প্রদান করিয়াছেন। নিরপরাধে অসহয়া রমণীকে বর্জ্জন করিবার ক্ষমতা যদ্যপী পুরুষের থাকে, তবে বিবাহের পবিত্র মহৎ উদ্দেশ্য পদে পদে ভঙ্গ হইতেছে যাহার দ্বারা, সেই পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার নারীর কেন না থাকিবে? যদি বল নারীর সে অধিকার আমাদের শাস্ত্রবিশেষে নাই, তবে আমি বলি সে শাস্ত্র মনুষ্যত্ববিহীন,

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

নারীর বিবাহবন্ধন আরও পবিত্র ও মনোহর হইয়া উঠিবে।

৬ষ্ঠ। বিধবার বিবাহ না দিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করা, কাহার কাহার অভিপ্রায়। অর্থাৎ কথা এই যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিধবাদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোকাবহ এবং দুঃখজনক, তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে তুলিয়া কিঞ্চিৎ সুখ স্বচ্ছন্দে রাখাই উচিত, বিবাহের আবশ্যকতা নাই। এ কথার উত্তরে আমি আগে বলিব যে, পুরুষের ও স্ত্রী বিয়োগ হইলে, আর বিবাহ না করিয়া নিজ অবস্থার উন্নতি করা উচিত। আর এক কথা আমার অবস্থার উন্নতি করা আমা সাপেক্ষ না অন্য সাপেক্ষ? ও আমার উন্নতি কিসে ভাল হয় এ বিষয় আমি যত বুঝি, অন্যে তত কখনই বুঝিতে পারে না। বিধবা যদ্যপি বিবাহকেই আপনার অবস্থার উন্নতি বলিয়া বোধ করে আর তুমি যদি বল বিবাহের আবশ্যকতা কি? তাহা হইলে তোমার বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতি করা হইল কিরূপে? আরও প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিবাহাপেক্ষা যদ্যপি বিধবার অবস্থোন্নতি করা উচিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে বিবাহ অনুচিত। বিবাহ প্রথা অনুচিত এ কথা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। বিবাহ মানব জীবনের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য, অবশ্য পালনীয় ব্যাপার, এমন অনেক শিক্ষা মানবের আছে যাহা বিবাহ না করিলে আরম্ভ হয় না। বিবাহ মনুষ্যের পূর্ণতাসাধক, মনুষ্যত্বসাধক, অবিবাহিত জীবনে

জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হয় না; অবিবাহিত জীবন জীব সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, সুতরাং বিবাহ নরনারী প্রত্যেকের পক্ষেই অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। যিনি প্রকৃত পক্ষে হতভাগিনী বিধবাগণের অবস্থোন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইতেছেন, তিনি পরোক্ষভাবে তাহাদের বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন, কারণ বিবাহ না হইলে অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না।

৭ম। কেহ বলেন বিধবা-বিবাহ আচারবিরুদ্ধ-ব্যাপার সুতরাং অপ্রচলন থাকাই ভাল। বিধবাবিবাহ আচারবিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আচারসম্মত; আর যদিইবা আচারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে এক আচার কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না, কালে কালে আচারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে! যেমন মনুর সময়ে শূদ্র জাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে পারিত না, শূদ্রে বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর সে নিয়ম নাই, শূদ্র ব্রাহ্মণের আসনে উপবেশন করা দূরে থাক্, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে, অধ্যয়ন দূরে থাক্, শূদ্রে বেদের অধ্যাপনা করাইতেছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপনয়নের পর কিছু কালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, কিন্তু এখন তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। মনুসংহিতা ও মহাভারতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, তখন অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী তাহাকে মধুপর্কে

গোমাংস দান করিতেন। সেই জন্য অতিথির অপর একটি নাম গোঘ্ন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ অনুষ্ঠান এক কালে রহিত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, যাহার প্রচলন এখন আর নাই। তারপর দেখিতে পাওয়া যায় এমন অনেক আচার আজ কাল প্রচলিত হইয়াছে, যাহা প্রাচীন সময়ে একেবারে ছিল না। যেমন বৈদ্য জাতির উপবীত আগে ছিল না, কিন্তু এখন হইতেছে, বৈদ্যেরা পূর্ব্বে এক মাস অশৌচ ধারণ করিতেন, কিন্তু এখন পঞ্চ দশ দিবস মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজা রাজবল্লভের সময় হইতে এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখ, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল আচার ব্যবহার জন-সমাজে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছুই নাই এবং পূর্ব্বে যে সকল আচার প্রচলিত ছিল না, এখন সে সকল প্রচলিত হইতেছে। সামাজিক কোন আচার কখন চিরস্থায়ী বা অপরিবর্ত্তনের থাকিতে পারে না। মানব সমাজের আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কত প্রকার আচার ও নিয়ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, আবার তিরোহিত হইয়া গেল। সুতরাং বিধবাবিবাহ আচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত হইতে না দেওয়া নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। আর বিধবা বিবাহ আচার বিরুদ্ধই বা কি প্রকারে বলি, যাহার প্রচলন হিন্দু সমাজের প্রাচীন সময়ে বহুল পরিমাণে ছিল, যাহার আবশ্যকতা

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

উপলব্ধি করিয়া নারদ, বিষ্ণু, পরাশর, প্রভৃতি প্রত্যেক সংহিতাকারেই স্ব স্ব গ্রন্থে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্ব্বকালপ্রচলিত শাস্ত্রানুমোদিত প্রথাকে যদ্যপি আচার বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা কর, তবে প্রকৃত পক্ষে কি তাহাতে সত্যের অপলাপ করা হয় না ?)

(৮ম। এ দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। সেই জন্য অনেকে বলেন যখন কুমারীর পাত্র পাওয়াই দুর্ঘট, তখন আবার বিধবার পাত্র কিরূপে মিলিতে পারে ? বিগত জন সংখ্যার নিরূপণানুসারে বঙ্গ দেশে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা কত, পাঠক বর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা।

	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী এত অধিক
	৩৪৬২৫৫৯১	৩৪৯১১২৭০	২৮৫৬৭৯
হিন্দু	২২৫৭৮১৪৪	২২৮৭৪২৬২	২৯৬৭১৮

এই ২২৮৭৪২৬২ স্ত্রী সংখ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত বয়ঃক্রমের বিধবা ২৯০০২৩ এত জন ;

দশ বৎসরের ন্যূন,	১০ হইতে ১৪,	১৫ — ১৯,	২০ — ২৪
১১৯২৮।	৩৭৯০২।	৯৩০৯৩।	১৪৭১০০।

বিধবার সংখ্যা আর ও আছে, কারণ ইহাতে কেবল চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্তদিগকেই ধরা হইল। উপরে যে ২২৮৭৪২৬২ স্ত্রীর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে

বিবাহিতা, অবিবাহিতা এবং বিধবা আছেন। সেইরূপ আবার পুরুষের সংখ্যার মধ্যে ও বিবাহিত, অবিবাহিত এবং বিপত্নীক (Widower) আছেন। ইহাতে যদিও দেখা যাইতেছে যে, নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, তাহা হইলে যে বিধবাবিবাহ হইতে পারে না, এ কথার কোন অর্থ নাই। কেন না মনে করুন, আপনি শুনিলেন বীরভূম প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, ইহা শুনিয়া কি আপনি আপনার আহার বন্ধ করিবেন? কারণ আপনি যে অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন তদ্দ্বারা একজন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের অন্নাভাব ত দূর হইতে পারে। আপনি আহার বন্ধ করিতে পারেন না কেন? না, আহার আপনার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, একান্ত চাইই; আহার আপনার কর্ত্তব্য বিশেষ। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যেমন কেহ আপনার আহার বন্ধ করিতে পারেনা, সেইরূপ নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম বলিয়া বিধবার বিবাহ অপ্রচলিত হইতে পারে না। কারণ বিবাহ মনুষ্যের মনুষ্যত্বসাধক পূর্ণতাসাধক, মানব জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার, সুতরাং ইহা নারীর একটি গুরুতর কর্ত্তব্য। দেশে পুরুষের সংখ্যা দশগুণ অধিক হউক, তথাপি তুমি কে? যে বিধবাকে তাহার জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যের পথ হইতে লক্ষ্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চাও?

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

দেশের কত শত লোক দারুণ দুর্ভিক্ষের অনলে পুড়িয়া মারা যাইতেছে, ইহা দেখিয়া কি তুমি তোমার কন্যাকে আসিয়া বলিতে পার যে "তুমি অদ্য হইতে আর অন্নাহার করিও না, তুমি যে অন্ন খাও, তাহা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে পাঠাইয়া দাও;" যদি না পার, তবে কিরূপে তুমি তোমার বিধবা কন্যাকে বলিতে পার যে "তুমি বিবাহ হইতে, তোমার জীবনের কর্ত্তব্যের পথ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জীবন যাপন কর।" পুরুষ অপেক্ষা নারীর পরিমাণ অধিকতর বলিয়া, বিধবা বিবাহ হইতে পারে না এ কথাই আসিতে পারেনা। তারপর দেখা উচিত অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে এ গোল মিটিয়া যায়। এবং অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানানুমোদিতও বটে।

১ম। কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করেন যে, একে ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ; তাহাতে আবার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে তদুৎপন্ন সন্তান সমূহে এদেশে আরও অন্নাভাব উপস্থিত হইবে। কারণ যে খাদ্যে একশত লোকের এক বেলা করিয়া হয়, সেই খাদ্যে আর একশত লোক উপস্থিত হইলে সকলেরই যে বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। অতএব বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ অমূলক কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া কোন একটা সামান্য বিষয়েও নিরস্ত থাকা উচিত মনে করি না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে তাহাদের

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

গর্ভজাত সন্তানে দেশের লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে, না ও হইতে পারে, কারণ ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তুমি তাহা কিরূপে জানিতে পার, হয়ত তখন এক ভয়ানক নৈসর্গিক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া দেশের অর্দ্ধেক লোক মারা যাইতে পারে। দেশের লোক বৃদ্ধির উপর হিতৈষীর যদি এত ভয়, তবে এমন একটা রাজাদেশ (Law) প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেকেই একটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিলে কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, দেশের দরিদ্রতা নিবারণের কি কোন উপায় নাই? দেশের দরিদ্রতা নিবারণের শত শত উপায় আছে। তাহা জানিয়া ও কিরূপে জনসমাজের একটি অত্যাবশ্যকীয় অশেষ কল্যাণকর ব্যাপারে ব্যাহত করিতে অগ্রসর হও? রত্নগর্ভা বহু শস্যশালিনী ভারত ভূমি এমন স্থান নয় যে, ইহাতে জন সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ অসাধ্য হইয়া উঠিবে। তোমরা নিজের দোষেই তোমাদের দেশকে দিন দিন দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছ, তোমরা নিজের দোষেই এই হতভাগিনী জন্মভূমিকে দুর্ভিক্ষের অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিতেছ। তবে আপনার দোষের জন্য, স্বানুষ্ঠিত অপরাধের জন্য কি এই অধঃপতিত সমাজকে আরও অধঃপাতে দিতে চাও? আর ও কি বিবিধ পাপপুঞ্জে ইহাকে কলুষিত করিতে চাও?

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

১০ ম। অনেকে বলেন বিধবার গর্ভজাত সন্তান, সন্তানের ত অতি নিকৃষ্ট স্থানীয়। পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইয়া কি, কখন বিধবা বিবাহ ধর্ম্ম সঙ্গত বলিতে পারা যায়? মহর্ষি মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভব অর্থাৎ বিধবার পুনর্ব্বিবাহজাত পুত্রকে দশম স্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও মনু বিধবার গর্ব্ভোৎপন্ন পুত্রকে নিকৃষ্ট স্থানীয় করিয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণু ঋষি বিধবার বিবাহজাত পুত্রকে চতুর্থ স্থানীয় করিয়াছেন। তাহা হইলে মনু অপেক্ষা বিষ্ণু বিধবার গর্ভজ সন্তানকে অধিকতর উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি বিধবার বিবাহোৎপন্ন পুত্র, ঔরস পুত্র। পরাশর কলিযুগে তিন প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঔরস, দত্তক এবং কৃত্রিম। বিধবার গর্ভজাত পুত্র দত্তক ও নয়, কৃত্রিম ও নয়, ঔরস। মনু ঔরস পুত্রের এই রূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযম
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতম্॥

নবমাধ্যায়।

অর্থাৎ বিবাহিতা সজাতীয়া স্ত্রীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই ঔরস পুত্র এবং মুখ্য পুত্র। তবে কিরূপে বলিতে পারেন যে, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ জাত পুত্র ঔরস পুত্র নয়। ঔরস পুত্রের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা হইতে আর বিধবাগর্ভজাত পুত্রের বিশেষ কি? হিন্দু শাস্ত্রকারেরা

বিধবার গর্ভোৎপন্ন পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।) মহাভারতের টীকাকার নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা দুহিতার গর্ভজাত পুত্রকে স্পষ্টাক্ষরে "পুত্রমৌরসম্" অর্থাৎ ঔরস পুত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিধবা বিবাহের বিরোধী পক্ষের নিকট এখন জানিতে চাই যে, তাঁহাদের এমন কি যুক্তি আছে, যদ্দ্বারা তাঁহারা বিধবাবিবাহোৎপন্ন পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। এত ক্ষণ আমরা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল প্রধান প্রধান আপত্তি ছিল, সে সকল একে একে খণ্ডন ও তাহাদের অসারতা প্রতিপাদন করিলাম। এক্ষণে আমরা বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত কি না তাহা দেখাইতেছি।

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ।

বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত কি না?

বেদ বিশেষতঃ ঋগ্বেদ হিন্দু জাতির আদিম গ্রন্থ ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। হিন্দু সমাজের আদিম আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। হিন্দু

দিগের সকল গ্রন্থ কিছু এক সময়ে রচিত হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আচার ব্যবহার সেই সেই সময়ে রচিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সংহিতা মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহ যে হিন্দু সমাজের আদিম কাল হইতে প্রচলিত চির-ন্তন প্রথা, তাহা বেদ ও তৎপরবর্ত্তী কাল রচিত সংহিতা সকল মধ্যে লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে এই প্রথা হিন্দু সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সে সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে মৃত পতির সমীপে শায়িত বিধবা নারীকে আত্মীয় স্বজনেরা হস্ত ধরিয়া আহ্বান করিতেন এবং বলিতেন "তুমি জীবলোকে আসিয়া পতি গ্রহণ কর।" ঋগ্বেদের এক স্থানে এই রূপ আছে।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্ত গ্রাভস্য দিধিষোস্তু বেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ॥

ঋগ্বেদ। ১০। ২। ২। ৮

অর্থাৎ হে নারী! উত্থান কর, জীবলোকে আগমন কর তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে বৃথা নিদ্রিত রহিয়াছ।, আইস, তোমার পাণি গ্রহণ কারী কর্ত্তৃক তুমি পূর্ব্বে মাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বৈদিক সময়ে মৃত পতির পার্শ্বে শায়িত নারীকে অহ্বান করিয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহিত করিত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়

আরণ্যকে ও ঠিক ইহার অনুরূপ একটী মন্ত্র পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহ যে বৈদিক সময়ে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা প্রত্নবিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "A Younger brother of the dead, a disciple, or a servant, should then proceed to the pyre, hold the left hand of the woman, and ask her to come away, saying "Rise up woman thou liest by the side of the lifeless, come to the world of the living, away from thy husband and become the wife of him who holds thy hand and is willing to marry thee × × × That the remarraige of the widowers in vedic times was national custom can be well established by a variety of proofs and arguments, the very fact of the Sanscrit language having, for ancient time such words as didhishu "a man that has married a widow" parapurva "a woman that has taken a second husband" punarbhava "a son of a woman by her second husband" † ইহার ভাবার্থ এই যে মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা অথবা অন্য কেহ সেই বিধবার নিকট গমন করিয়া বলিত যে হে নারী! কেন তুমি মৃতের পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছ; তুমি জীবলোকে আগমন করিয়া অপরের পাণি গ্রহণ কর"। বিধবা বিবাহ যে বৈদিক সময়ের জাতীয়

প্রথা (national custom) ছিল, তাহা ইনি উল্লেখ করিয়াছেন। সে সময়ে যে ব্যক্তি বিধবার পাণিগ্রহণ করিত। তাহাকে দ্বিধিষু বলা হইত। তার পর মনুসংহিতা যে সময়ে হিন্দু সমাজে রচিত হয়; তৎকালে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি বিষ্ণু বাল বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিয়াছেন।

অক্ষতা ভূয়: সংস্কৃতা পুনর্ভূ:।

অর্থাৎ অক্ষতযোনি নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার সংহিতার ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন——

অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূ সংস্কৃতা পুন:।

অর্থাৎ অক্ষত বা ক্ষত যে রমণী তাহার পুনর্ব্বিবাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে। যাজ্ঞবল্ক্যের সময় দেখা যাইতেছে ক্ষতযোনি বিধবা দিগের ও পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন নারদ পরাশর প্রভৃতি অন্যান্য স্মার্ত্তেরাও বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। আধুনিক স্মার্ত্ত নবদ্বীপ নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও সকল বর্ণের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য উদ্যত হন কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় শূদ্র বর্ণের জন্য সুস্পষ্ট বিধি প্রদান

করিয়া গিয়াছেন। † মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ও অনাভ্রাত বিধবার বিবাহ যুক্তিসম্মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। † শাস্ত্র-কারেরা যে কেবল ইহার বিধি করিয়া গিয়াছেন তা নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধবাবিবাহ যুক্তিযুক্ত কি না।

১ম। কি পুরুষ কি নারী বিবাহ সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যকীয় এবং একান্ত কর্ত্তব্য। মানব সমাজের উৎপত্তি এবং স্থিতির বিষয় চিন্তা করিলে, বিবাহকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। বিবাহবন্ধনই সমাজ বন্ধনের মূল। সুতরাং বিবাহ যেমন সামাজিক ভাবে আবশ্যক,

---

৫২ পৃষ্ঠার টীকা এই স্থানে প্রদত্ত হইল।—
Journal of the asiatic society of Bengal No IV 1870 Funural ceremonies of ancient Hindus নামক প্রস্তাব দেখ এবং Indian evangelical riview 1884 April সংখ্যক পত্রিকার remarriage of hindu woman নামক প্রস্তাব পড়িলে এবিষয় বিশেষ জানা যায়।

† শুদ্ধিতত্ত্ব সপিণ্ডাদ্যশৌচ প্রকরণ শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তকের ১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ। † মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৯। ৬৭

ব্যক্তিগত ভাবেও সেইরূপ আবশ্যক, অনেকানেক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, বিবাহ না হইলে পুরুষ অর্দ্ধেক এবং নারী অর্দ্ধেক, বিবাহসম্মিলনে পরস্পর মিলিত হইয়া পূর্ণত্ব একত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বিবাহের অভাবে কি পুরুষ কি রমণী কাহারও পূর্ণত্ব সম্পাদন হয় না, তদ্ভিন্ন নর নারীর অন্তঃকরণে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহা বিবাহ না হইলে সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় না। এবং সে সকলের পরিস্ফুটন না হইলে মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব উৎপন্ন হয় না, অতএব বিবাহ মনুষ্যত্বসাধক। অবিবাহিত জীবন—সন্ন্যাসীর জীবন, উদাসীনের জীবন। মানবজাতি উদাসীন ভাবে কাল যাপন করিবে, ইহা বিধাতার অভিপ্রেত নয়। মনুষ্য সামাজিক হইয়া, সাংসারিক হইয়া জীবনাতিপাত করিবে, ইহা সেই মঙ্গলময় পুরুষের ইচ্ছা। এই সংসারক্ষেত্র আমাদিগের শিক্ষাস্থল, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ইহারা আমাদিগের শিক্ষার সহায়। গৃহস্থ না হইলে সাংসারিক না হইলে আমাদের শিক্ষা হইল না, অতএব এ ভাবেও বিবাহ আবশ্যক। তারপর বৈধভাবে প্রজা উৎপাদন ও পরমেশ্বরের একটি সুস্পষ্ট অভিপ্রায়। পুত্রোৎপন্ন না হইলে কি পুরুষ কি নারী কাহারও জীবনের উদ্দেশ্য প্রকৃত পক্ষে সুসিদ্ধ হইল না। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে পুত্র না হইলে পিতা মাতাকে পরলোকে গিয়া পুন্নামক নরকে গমন করিতে হয়। "পুন্নামো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে

পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভূবা" শাস্ত্র মধ্যে ইহাও বিবৃত আছে যে, বিবাহিত পুরুষ কি রমণী সন্তানের নিমিত্ত দারান্তর বা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে। আর একটি কথা সাংসারিক না হইলে সামাজিক হওয়া যায় না। যে সংসারক্ষেত্রে অপরিপক্ক অপ্রবীণ, সে সমাজেও তদবস্থাপন্ন। আমরা স্ত্রী পুত্রদিগের নিকট প্রতি-দিন যে শিক্ষা পাই, উপদেশ পাই, সমাজেও সেই শিক্ষা পাইয়া থাকি, তবে পরিমাণভেদ থাকিতে পারে। এজন্য যে সংসারী নহে, সে সামাজিকও নহে। সমাজ সংসারের পরিণতি ও বিস্তৃতি মাত্র; মনুষ্য সামাজিক জীব, মনুষ্যকে সামাজিক হইতে হইবে, অতএব মনুষ্যকে অগ্রে সাংসারিক হইতে হইবে। কারণ "সাংসারিক না হইলে সামাজিক হওয়া যায় না।" সুতরাং বিবাহ চাই, নচেৎ মনুষ্য তুমি প্রকৃত সাংসারিক অথবা সামাজিক হইতে পারিবে না। এখন দেখা গেল বিবাহ মনুষ্যের পক্ষে কতদূর প্রয়োজনীয়। কেহ বলিতে পারেন, যে বিধবা ত্রেড্‌- বিবাহিতা, তবে আর তার বিবাহের আবশ্যকতা কি? আমি বলি আছে। তোমার সহিত যদি কোন নারীর বিবাহ হয় এবং সেই নারী তোমার নিকট কেবল মাত্র দুই বৎসর থাকিয়া সে চিরকালের জন্য তোমার সহিত পৃথক হইয়া স্থানান্তরে বাস করে, সরলভাবে বল দেখি তাহাতে তোমার বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি না? বিবাহের পুনরায় আব-

শ্যকতা হয়, কি না? নিশ্চই হয়; আমিত বলি বিধবা যে, সে অবিবাহিতা। অতএব অবিবাহিতের যদ্যপি বিবাহ আবশ্যক হয়, তবে বিধবারও কেননা আবশ্যক হইবে? বিবাহের অর্থ এ নয় যে, কোন পুরুষের পাণিগ্রহণ এবং তাহার সহিত কিয়ৎ কাল অবস্থান, বিবাহ চিরজীবনের জন্য, দুই পাঁচ বৎসরের জন্য নয়। অতএব বিধবা যিনি, তিনি মনুষ্যত্বহীন সামাজিকতাহীন অপূর্ণজীব। সংসার বা জন-সমাজ বিধবা নারীর উপযুক্ত আবাসক্ষেত্র নহে। যিনি এই কার্য্যময় শিক্ষাগার স্বরূপ সংসারে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তিনি পাপী, যিনি সেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তিনিও পাপী। যিনি বিধবাকে বিধবা হইয়া থাকিতে বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে উপদেশ দেন, তিনি বিধবার মনুষ্য-ত্বের পথে তাহার জীবনের কল্যাণ এবং উন্নতির পথে কণ্টকাবলী রোপণ করেন। অতএব বিধবার বিবাহ আবশ্যক, একান্ত আবশ্যক, কারণ, তাহা না হইলে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হইবে না, সে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, সে তাহার হৃদয় মনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। আবার বলি বিধবাকে যদি ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দাও, তবে তাহাকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অরণ্যে তাড়াইয়া দাও। কারণ বিধবা সংসারে থাকিবার—সমাজে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।

২য়। সমাজ সংস্কারককে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

পুরুষ স্ত্রীহীন হইলে যদ্যপি তাহাকে বিবাহের অধিকার দিতে পার, তবে নারী পতিহীনা হইলে কেন তাহাকে পুনর্ব্বিবাহের অধিকার না দিয়া থাক? নারীর পক্ষেই "নিবৃত্তস্তু মহাফলা" হয়, আর পুরুষের পক্ষে তাহা হয় না কেন? পুরুষের পক্ষে বুঝি "প্রবৃত্তস্তু মহাফলা"। যদি বল হিন্দু সাম্যবাদী নয় অনুপাতবাদী, আমি বলি তুমি জান না, হিন্দু ঘোর সাম্যবাদী, যদি চক্ষু থাকে খুলিয়া দেখ, হিন্দু শাস্ত্রের পত্রে পত্রে সাম্যের ছবি অঙ্কিত। সাম্যের অর্থ যাঁহারা বলেন, মানুষে মানুষে সমান, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত! সাম্যের অর্থ মানুষে মানুষে সমান নয়, কিন্তু মানুষ মাত্রেই অধিকার বিষয়ে সমান। মানুষ মাত্রেই সকল বিষয়ে সমান অধিকারী ইহাই সাম্যবাদের অর্থ। সাম্যবাদী বলেন পুরুষ যে বিষয়ে যে অধিকার পাইবে—নারীও সেই বিষয়ে সেই অধিকার পাইবে, ব্রাহ্মণ যে বিষয়ে যতটুক অধিকার পাইবে, শূদ্রকেও সেই বিষয়ে ততটুকু অধিকার দিতে হইবে। যে শাস্ত্রে নর নারীকে সমান অধিকারের আদেশ প্রদান করে, সে শাস্ত্রকে মস্তকে বহন করিব, যে শাস্ত্রে তাহা করে না, নর নারীর অধিকার বৈষম্য ঘোষণা করে, সে শাস্ত্রকে পদতলে দলিত করি, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পুরুষ এবং রমণীকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তবে পুরুষে পত্নী বিহীন হইলে, যদি তাহার আবার বিবাহে অধিকার থাকে, তবে বিধবার পুনর্ব্বিবাহে

কেন না অধিকার থাকিবে? তুমি বলিতে পার পুরুষে অন্যায় বোধ করিয়া স্ত্রী মরিলে যদি আর বিবাহ না করে, তাহা হইলে আর উপায় কি, আমরা বলি স্ত্রী হীন হইলে পুরুষে বিবাহ করুক আর নাই করুক, সে দিকে দেখিবার আবশ্যক নাই, বিবাহ যখন মানব জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তখন বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অবশ্য বিধেয় এবং যুক্তিযুক্ত।

৩য়। বিনা কারণে স্ত্রী সত্ত্বে ও যদ্যপী পুরুষেরা দারান্তর গ্রহণ করিতে পারে, তবে পতিহীন হইলে বিধবানারী কেন না অপরের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে, যখন জান যে, স্ত্রী পুরুষের অধিকার সমান. এবং জানিয়াও যখন পুরুষকে এবিষয়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিতেছ, তখন স্ত্রীকে তাহাতে কেমনা সমান অধিকার দান করিবে? পুরুষ বিষয় বিশেষে "থাকিতে" যে অধিকার পায়, স্ত্রী সেই বিষয়ে, "না থাকিতে" সেই অধিকার পাইবে না কেন?

৪র্থ। এদেশে স্ত্রীজাতির স্বামীই একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং স্বামীহীন হইলে এদেশীয় স্ত্রীদিগের অত্যন্ত দুর্গতি উপস্থিত হয়। এই হেতু এদেশে বিধবা বিবাহের যত আবশ্যক, অন্য কোন দেশে তত নয়। এমন দেখা গিয়াছে যে, অনেক রমণী সধবাবস্থায় বেশ বিত্তবিভব শালিনী ছিলেন, সংসারের কোন অনাটন ছিল না, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল, তিনি বিধবা নিরাশ্রয়া হইয়া পড়িলেন; আর আত্মীয়

স্বজনেরা চক্রান্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে বিপদগ্রস্থ করিতে লাগিল, তাঁহার ধন সম্পত্তি একে একে নষ্ট হইতে লাগিল; অবশেষে তিনি পথের ভিখারিণী হইয়া অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। এক দিকে যেমন এইরূপ দেখা যায়, অপর দিকে আবার অন্যরূপ দেখা যায় যে, অনেক পশুপ্রকৃতি দুশ্চরিত্র পুরুষ ঘৃণিত পাপবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত কত শত অসহায়া বিধবানারীর উপর অহোরাত্র উৎপাত ও অত্যাচার এবং সময়ে সময়ে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে থাকে, নিরাশ্রয়া বিধবা সেই দুর্বৃত্তদিগের এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়া অনেক সময়ে বিরলে বসিয়া বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকেন। বাস্তবিক পতিহীনা নারীর এদেশে এইরূপ দুঃখ দুর্গতি উপস্থিত হয়। এখন বল দেখি বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিয়া সেই অসহায়া কামিনীকুলকে দারুণ দুঃখ দুর্গতি এবং অশ্রুজলের হস্ত হইতে উদ্ধার করা উচিত? না, তাহাদিগকে দুস্তর দুঃখসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত এবং হয়ত বা সতীত্বরূপ পরম ধর্ম্মের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেওয়া উচিত?

৫ম। এমন বিধবা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যে যাহারা রিপু দমন করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। সকল দেশীয় পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিতেছেন রিপু দমন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার। কত জ্ঞানাপন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি, কত ধর্ম্মপথাবলম্বী সাধুব্যক্তি

রিপুর উত্তেজনায় স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়াছেন। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা যদি কিছু বীরত্বের কার্য্য থাকে, তবে তাহা রিপুদমন। তোমরা জান এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত, তোমরা জান ইহারা বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানাংশে পুরুষাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হীন, এবং তোমরা ইহাও বলিয়া থাক, পুরুষাপেক্ষা নারীজাতির রিপুবিশেষ অষ্টগুণ বলবতী, তবে তোমরা জানিয়া শুনিয়া কিরূপে তাহাদিগকে সেই পথে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ দিয়া থাক? ইহা অতি সত্য কথা যে, যে পিতা মাতা তাহাদের বিধবা কন্যাকে বিধবা হইয়া থাকিতে বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে উপদেশ দেন, তাহারা নিশ্চয়ই তাহাকে পাপ পথে দণ্ডায়মান হইতে উপ-দেশ দেন। যিনি বলেন, "কন্যা তুমি ব্রহ্মচর্য্যে কাল যাপনকর" পরোক্ষভাবে তাঁহার বলা হইল "কন্যা তুমি অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন কর।" বলা বাহুল্য যে, লেখক কোন বিধবা কন্যার পিতার মুখ হইতে এরূপ অমানুষিক কথা তাঁহার কন্যাকে বলিতে শুনিয়াছেন। হায়রে! অধঃপতিত দেশ! নচেৎ তোর এমন দশা ঘটিবে কেন? ধিক্ ধিক্ শতধিক্ সেই সকল ব্যক্তিকে, যাহারা পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াও রিপুর উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া, অক্লেশে অসঙ্কুচিতভাবে দারান্তর গ্রহণ করিতে উদ্যত হন; অথবা অতি নিকৃষ্ট পথ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, অথচ একবারও দৃষ্টিপাত করেনা যে,

তাঁহার গৃহে পূর্ণযৌবনা কন্যা কিরূপে কাল যাপন করিতেছে। এ দিকে বিধবা কন্যা রিপুর কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া গোপনে প্রলোভন তরঙ্গে জীবনতরি ভাসাইয়া দিল। এখন বল দেখি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?

৬ষ্ঠ। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলে পারবারিক নিতান্ত অশান্তি এবং অমঙ্গল। পরিবারের মধ্যে বিধবা নারী আছেন, তিনি কালক্রমে দুশ্চরিত্রা হইয়া পড়িলেন।

যে পরিবারের মধ্যে একজন দুশ্চরিত্রা নারী থাকে, সে পরিবারে অমঙ্গল অশান্তি উপস্থিত হয় কি না? সংসর্গ-দোষে মানুষ নীচত্ব প্রাপ্ত হয়; এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যে পরিবারে একজন পাপাসক্তা রমণী থাকে, সে পরিবারে আরও পাপস্রোত প্রবাহিত হওয়া সম্ভব, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একের দোষে পরিবার নষ্ট—অনেক স্থলে তাহা দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তদ্দারা আরও নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। এইরূপ এক ব্যক্তির জন্য সমস্ত পরিবার অশান্তি, বিবিধ প্রকার অনর্থ এবং অমঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠে। সদ্বিবেচক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বিধবাবিবাহের প্রচলন দ্বারা এই সকল অনর্থ এবং অশান্তি নিরাকরণ করা একান্ত আবশ্যক এবং বিধেয়।

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

৭ ম। স্ত্রী হীন হইলে এদেশীয় পুরুষেরা প্রথানুসারে বিবাহ করিতে পারে, অথচ এদেশে স্ত্রীদিগের অধিক বয়সে বিবাহরীতি নাই, সুতরাং ভার্য্যাহীন বয়স্ক পাত্রকে অল্প বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে পরস্পরের মনোমিলন অসম্ভব, সুতরাং পরিণামে তাহাতে কুফল ফলিতে পারে। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদ্যপি প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে আর এরূপ হইতে পারে না। এই প্রথা প্রচলিত থাকিলে বয়স্ক পুরুষকে আর বালিকা কন্যার সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হয় না। এদেশে পরিবার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির ভাগ এত অধিক, তাহার কারণ কেবল স্ত্রী পুরুষের মনোগত অমিলন অনৈক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর এই অমিলনের মূল, অধিক বয়স্ক পুরুষের সহিত অল্প বয়স্কা কন্যার বিবাহ। যুবকের সহিত যেমন বালকের মিলন হইতে পারে না, কিন্তু যুবকেরই হয়, সেইরূপ দশমবর্ষীয়া বালিকার সহিত কখন ত্রিংশৎ বর্ষবয়স্ক পুরুষের মনে মনে হৃদয়ে হৃদয়ে ঐক্য হইতে পারে না। সুতরাং এদেশে বিধবাবিবাহের আরও আবশ্যক।

৮ ম। বিধবাবিবাহের অপ্রচলন জনিত দেশ মধ্যে একটী ভয়াবহ ঘৃণিত কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। ভ্রূণহত্যা ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। ভ্রূণহত্যা কি ঘোরতর অধর্ম্ম নয়? ভ্রূণহত্যা কি জনসমাজের একান্ত পরিহার্য্য জঘন্য ব্যাপার নয়? যে পাপ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই; যে কার্য্য

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

অপেক্ষা বীভৎস জুগুপ্সিত-কার্য্য আর কিছুই নাই, সেই কার্য্যের স্রোত অপ্রতিহত গতিতে আমাদের সমাজ মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন জন্য। পুণ্য-ভূমি ভারতভূমি! তুমি কলুষিত হইয়াছ, ভ্রূণহত্যার পাতিত রক্তে; পবিত্র সমীরণ! তুমি বিষাক্ত হইয়া গিয়াছ তাহা-দিগের উষ্ণনিশ্বাসে, বসুন্ধরা আর এ মহাপাতকের ভার বহন করিতে পারে না। হিন্দুসমাজ তুমি নির্জ্জীব, তুমি মৃত নচেৎ এ ঘৃণিত পাপানুষ্ঠানের প্রশ্রয় দিতেছ কিরূপে? এমন কে আছেন, যিনি বলিতে পারেন যে, বিধবাবিবাহ যদিও আমাদের সমাজে প্রচলিত নাই, তথাপিত কই ভ্রূণ হত্যা হয় না। এ কথা যিনি বলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ করেন। এই কথার সত্যতার জন্য যদি সাক্ষ আহ্বান করি, তবে বঙ্গের প্রত্যেক পল্লী, হয়ত প্রত্যেক পরিবার উত্থিত হইয়া ইহার সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিবে। কেন এই পাপস্রোত উত্তরোত্তর প্রবলতর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, কেন দুরপনের কলঙ্কে হিন্দুসমাজের মুখ দিন দিন কলঙ্কিত হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ এইযে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হওয়া। তুমি স্বীকার কর বা না কর, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিবে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়া। কেবল যে এই ব্যাপারে একটি নরহত্যা হইতেছে তা নয়, সময়ে সময়ে প্রসূতি পর্য্যন্ত প্রাণ হারাইয়া থাকেন। অকালপ্রসবজনিত মারাত্মক

ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কত সময় সেই হতভাগিনী বিধবার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হয়। সুতরাং কখন কখন এক জনকে বিনাশ করিতে গিয়া দুইজনে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, একজন মনুষ্যকে মারিতে গিয়া দুইজনে মারা পড়ে। এখন সমাজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত রাখিয়া এই জঘন্য পাপপ্রবাহ সমাজ মধ্যে প্রবাহিত রাখা উচিত? না, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিয়া সমাজ হইতে এই সকল ন্যক্কারজনক ঘৃণিত পাপচ্ছবি অপসারিত করা উচিত?

৯ম। বিধবা কন্যা পিতা মাতার হৃদয়ের শেলস্বরূপ। যে পরিবারে বিধবা কন্যা আছে, সে পরিবারের পিতা মাতার যে কি আন্তরিক ক্লেশ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। জনক জননী আহার নিদ্রায় সুখ শান্তি পান না, জননী গাত্রে অলঙ্কার ধারণ করিতে পারেন না, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন না, পাছে কন্যা মনে ক্লেশ পায়। একাদশীর দিন যখন সমস্ত দিনের অনাহারে কন্যা প্রখর তাপে তাপিতলতার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন বিন্দু পরিমাণ বারির অভাবে বালিকা বিধবা কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া মৃতার ন্যায় হইয়া পড়ে, তখন জনক জননীর হৃদয় শত লৌহশলাকায় বিদ্ধ হইতে থাকে, ইহার উপর আবার আর এক আশঙ্কায় পিতা মাতার প্রাণ নিরন্তর শঙ্কিত ও চঞ্চলিত হইতে থাকে, সে আশঙ্কা এই যে, পাছে কোন

দুশ্চরিত্র লোক কন্যার উপর কোনরূপ কুব্যবহার করে। যে ঘরে বিধবা কন্যা বর্ত্তমান, সে ঘরের পিতা মাতার প্রাণ এইরূপ অশান্তি এবং আশঙ্কায় দিবা রজনী অতিবাহিত হয়। বিধবাবিবাহ যখন শাস্ত্রানুমোদিত, বিধবাবিবাহ যখন পরম্পরাগত প্রথা, বিধবাবিবাহ যখন যুক্তিযুক্ত এবং সমাজের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর, তখন তাহা প্রচলিত করিয়া কি বিধবা কন্যার হতভাগ্য পিতা মাতার হৃদয়ের যন্ত্রণানল নির্ব্বাপিত করা উচিত নহে?

১০। বিধবাবিবাহ যে যুক্তিযুক্ত, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা সম্যকরূপে বুঝিয়া ছিলেন এবং বুঝিয়াই তাহা প্রচলনের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। বৈদিক ও তৎপর সময়ের প্রায় সকল সংহিতাকারেরাই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা যুক্তিযুক্ত, প্রাচীনতম বৈদিক সময়ের ঋষিগণ হইতে আধুনিক সময়ের স্মার্ত্তরঘুনন্দন পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রথার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রথাকে হিতকরী বোধ করিয়া অনেকানেক ব্যক্তি স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের রাজারাজবল্লভ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা পান; জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ, কোটাধিপতি জালিমসিংহ, এবং দক্ষিণাপথনিবাসী পৎবর্দ্ধন নামক জায়গিরিদার স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে এই শুভকরী প্রথা প্রচলনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আমাদের দেশে আধুনিক সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে এই আন্দোলন উপস্থিত হয়; যদিও সে আন্দোলনে প্রথম কিছু শুভফল উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে তাহা কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতেছে। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার প্রচলন নিমিত্ত বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে। পশ্চিম প্রদেশীয় যোধপুরী ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের দেশে স্বজাতির মধ্যে এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাহউক এখন প্রতিপন্ন হইল বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ও যুক্তিযুক্ত বটে। এবং ইহার বিরুদ্ধপক্ষে যে সকল আপত্তি ছিল, তাহাও ইতিপূর্ব্বে বিষদভাবে খণ্ডন করিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে জানিতে চাই, আমাদের এই সকল কথা এবং যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করিয়া কেহ বিধবাবিবাহের নিকৃষ্টতা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন কি না? যদি পারেন তাহা হইলে তিনি প্রমাণ করুন।

সমাপ্ত।